বালিকার চন্দ্রযান

সৈয়দ শামসুল হক

BENGALIEBOOK.COM
2022

সূচিপত্র

১. শনি আর রোববার ছুটির দিন 3
২. তিনটে শোবার ঘর 11
৩. ইয়াসমিন চা নিয়ে আপিস ঘরে এলো না 20
৪. ম্যানচেস্টার থেকে নটার দিকে 29
৫. বজুলল করিম সাহেব আসবেন 40
৬. ইয়াসমিন আজ নবজন্ম গ্রহণ করিল 47
৭. রাগের মাথায় বললেও 64
৮. মাহজাবীন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে 77
৯. এক প্রস্থ ধোঁয়া গেলার পর 87
১০. শাপলা ট্রাভেল এজেন্সির সাইনবোর্ড 95
১১. অত্যন্ত নিশ্চিত ও মূল্যবান সামগ্রী 103
১২. আপিস ঘরে বারী আর ভাইয়ান 110
১৩. গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে 117

১৪. বজলুল করিম টিকিটটা ভালো করে দেখে 123

১৫. ইলিং থেকে আলবানি স্ট্রীট 127

১৬. অধিকার বোধের পাখায় ভর করে 133

১৭. নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছি 141

১৮. ঘুম আসে না ইয়াসমিনের 152

১. শনি আর রোববার ছুটির দিন

শনি আর রোববার ছুটির দিন হলেও মিস্টার আলির ছুটি নেই। তাঁকে কাজ করতে হয়। শনিবার দিন তো শাপলা ট্রাভেল এজেন্সি তাঁকে খোলা রাখতেই হয়, রোববারে বেরুতে হয় লন্ডনের বাইরে খদ্দের পটাতে, নতুন খদ্দেরের জন্যে জাল ফেলতে। ম্যানচেস্টারে। বার্মিংহামে, কার্ডিফে। এসব জায়গায় বাঙালি আছে, ভারতীয় আছে, আছে পাকিস্তানি। তবে মিস্টার আলি পাকিস্তানি পাড়ায় আর পা বাড়ান না; অথচ একাত্তর সালের জুন মাস পর্যন্ত লন্ডনে তিনি পি.আই.এ-তে চাকরি করা কালে বিস্তর পাকিস্তানির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বিলেতে এখন পাকিস্তানিরা বাঙালিকে ব্যবসা দেয় না। অথচ, মিস্টার আলি ক্রোধ অনুভব না করে পারেন না, বাঙালিরা দিব্যি ব্যবসা দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানিদের। তাঁর এই ক্রোধ দেশাত্মবোধক হবে বলে মনে হতে পারে কইরে থেকে। অনেক বাঙালি খদ্দের তার কাছে কিন্তু আসে তিনি বাঙালি বলে। তারা বলে, এক পাকিস্তানির কাছে কিছু সামান্য দর পেয়েছিলাম, কিন্তু আপনার কাছেই এলাম, পয়সা যদি দিতে হয় তো বাঙালিকেই দেব। অথচ তারা জানে না, মিস্টার আলিকে খদ্দেরের মাল প্যাকিংয়ের জন্যে অন্তত পাকিস্তানি মিস্টার খানের কাছে যেতে হয়। এই তথ্যটি তিনি সযত্নে গোপন রাখেন এবং খদ্দেরকে বলেন তাঁর নিজস্ব ওয়ের হাউস আছে, প্যাকার আছে। গতকাল এক বাঙালির হাজার তিনেক পাউন্ডের ব্যবসা অল্পের জন্যে তিনি পান নি। পেয়েছে মিস্টার খান। দেশমুখো বাঙালিটি যতরকম বিজলীর জিনিস বাজারে, প্রায় সবই। নিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকবার মিস্টার আলির কাছে এসেছেন, তালিকা করেছেন, এক রকম কথাও দিয়েছেন তার কাছ থেকেই কিনবেন। শেষ পর্যন্ত কিনলেন তিনি মিস্টার খানের কাছ থেকে। আলিকে যেতে হয়েছিল খানের কাছে একটা কাজে,

আর সেখানে গিয়ে দেখেন বাঙালিটা সওদা করছে। এমন নির্লজ্জ, লোকটি অপ্রস্তুত হয় নি। অবশ্য, সেটাও ভেবে। দেখেছেন আলি, বিলেতে কষ্ট করে এক কামরায় রান্না-থাকা-খাওয়া করে জমিয়ে জিনিস কেনার সময় যেখানে সুবিধে, এক পয়সা সুবিধে হলেও সেখানে কিনবে বৈকি। বাংলাদেশে বাপের দৌলতেও যা কেনার মুরোদ হয় না বহু বড়ে খাঁর এখানে ইংরেজের মতো কামিয়ে আর বাঙালির মতো বাস করে, হেজিপেজিও ফ্রিজ টেলিভিশন রিকনডিশন্ড গাড়ি কিনে ফেলে। গরীবের জুতো হলে যা হয়, ঘুমোবার সময় পর্যন্ত জুতো বালিশের পাশে নিয়ে শোয়। চক্ষুলজ্জা থাকবে কেন?

তবু মনটা খিচড়ে ছিল আলির।

বসত বাড়িরই নিচের তলায় সমুখের ঘরে তার কোম্পানির আপিস–শাপলা ট্র্যাভেলস এজেন্সি। কিম্বা বলা যায়, দোকানের ওপর তলায় তার বাসা।

সকাল নটায় সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, স্ত্রী কামরুন্নাহার পেছন ডাকে।

এই শোন।

আলি বিরক্ত হন। পেছন ডাক মোটেই তিনি পছন্দ করেন না। তাও দিনের শুরু ভোর বেলায় খোদার নাম নিয়ে আপিস খোলার সময়।

মনটা আরো খিচড়ে গেল তার। পেছন ডাকার দোষ কাটাতে তিনি আবার ফিরে এলেন ঘরে।

কী হলো?

না, জিগ্যেস করছি, তুমি আবার বাইরে টাইরে যাচ্ছ না তো?

যাবার থাকলে তো বলেই যেতাম।

বলেই তিনি যান সব সময়। কারণ, তিনি যখন বাইরে থাকেন, কামরুন্নাহারকে আপিসে বসতে হয়। স্বামীর কাজ সে ভালো গোছাতে পারে না, তবে ফোন ধরা, খদ্দের এলে। প্রাথমিক আলাপ করা, লেনদেনের ব্যাপার থাকলে চেক নেয়া, রশিদ দেয়া, এ সব চালিয়ে নিতে পারে।

নাহার হেসে বলে, তোমাকে ডেকেছি একটা কারণে। একবার নিচে নামলে তো আর বাথরুমের দরকার ছাড়া দুটোর আগে ওপরে উঠবে না। বলছিলাম, কাজে যাবার আগে মিনার সঙ্গে একটু কথা বলে যাও।

মিনা, ইয়াসমিন, ওদের বড় মেয়ে।

এক্ষুণি বলার কী আছে?

আলি ঠিক বুঝতে পারেন না, বিয়ের প্রস্তাবই হয় নি এখন পর্যন্ত, এর মধ্যে মেয়ের সঙ্গে কথা কীসের? আজ একজন আসছে ইয়াসমিনকে দেখতে। আনুষ্ঠানিক দেখা নয়, তবু বাড়ির সবাই জানে, পছন্দ করতেই আসছে।

তোমার মেয়ে যদি বিগড়ে বসে?

কেন? বিগড়াবে কেন? বয়স কম হয় নি। বিয়ে বসতে হবে না? নাকি, সে তোমাকে কিছু বলেছে?

এখনো বলে নি, তবে, সন্দেহ করি, বলবে। তোমার মেয়ে তো মেম সায়েব।

ভ্রু কুঞ্চিত করে রাখে আলি।

নাহার বলে, তুমি একটু বসো, মেয়েকে ডেকে দি। তুমি নিজে বলে দাও, শনিবার দেখে যেন আবার বেরোয় না। কাল রাতে পার্টি করেছে। আজ বাড়িতে থাক। একটু রেস্ট না নিলে চেহারাই বা কী দেখাবে? আর ডাক্তার যখন আসবে, তার সঙ্গে যেন একটু ভালো করে কথাটা কয়।

স্কটল্যান্ড থেকে ইয়াসমিনকে দেখতে আসছে ডাঃ ভাইয়ান। মানে, ডাঃ ইউনুস ভূঁইয়া। ইংরেজের মুখে 'ভূঁইয়া হয়েছে 'ভাইয়ান। এখন সেটা নামের খোদ মালিক নিজেই ব্যবহার করে।

তোমার কি মনে হয়, মিনা গোলমাল করবে?

স্ত্রীর কথায় আলি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। মেম সাহেব হয়ে যাবার উল্লেখটাও তাকে চিন্তিত করে তোলে। মুখের ওপর ছেলেটিকে না বলে দেবে নাকি? রীতিমতো শংকিত হয়ে পড়েন আলি। যদুর যা শুনেছেন ডাঃ ভাইয়ানকে তার পছন্দ হয়েছে, শুধু চোখে দেখতে বাকি। আর ডাক্তার পাত্র, কম লোভনীয় নয়।

নাহার বলে, কাল পার্টিতে যাবার আগে বলছিল, মা, সতের বছর বয়সে তো তোমারও বিয়ে হয় নি। বিলেতে এসে তোক সভ্য হয়, তোমরা আরো পেছন দিকে যাচ্ছ।

সব তোমার আশকারা।

নাহার সত্যি সত্যি অবাক হয়।

আমার আশকারা?

নয়তো কী? এই যে পার্টি, কাল সন্ধে বেলায় পার্টিতে গেল, কখন ফিরল, কার সাথে ফিরল, খোঁজ করে দ্যাখ? ইংরেজ মা হয়েছ? মেয়েকে নিশ্চিন্তে অজানা অচেনা জায়গায়। ছেড়ে দিচ্ছ?

খোঁজ নিলে রাগ করে যে।

কেন? রাগ কীসের?

খোঁজ নিলে নাকি অবিশ্বাস করা হয়। সভ্য সমাজে ছেলেমেয়েকে বিশ্বাস করা হয়।

রাখ তোমার সভ্য সমাজ।

নাহার রাগ করে এবার।

আমার হয়েছে যন্ত্রণার একশেষ। একদিকে তুমি, আরেক দিকে মেয়েরা।

মেয়েরা বোলোলা না। আমার মাহজাবীন অন্য রকম মেয়ে। আদব কায়দা আছে।

মাহজাবীন ইয়াসমিনের দুবছর ছোট। বারো বছর আগে যখন এ দেশে প্রথম এসেছিলেন আলিরা, ইয়াসমিন সাত, মাহজাবীন পাঁচ। লন্ডনে তাদের তৃতীয় মেয়ের জন্ম হয়। নাসরিন, সে এখন ন বছরের।

আলি আরো বলেন, নাসরিন যদি নষ্ট হয় তো ঐ ইয়াসমিনের জন্যেই হবে।

ঝংকার দিয়ে ওঠে নাহার, বাড়িতে তুমি আছ কী করতে? মেয়েকে শাসন করতে পার না?

যাও, মেয়েকে বল, ডাক্তার এলে যেন ভালো ব্যবহার করে।

মেয়েদের সঙ্গে একটা দুরত্ব বজায় রেখে চলেন আলি। সেই রকমই দেখে এসেছেন তিনি তার বাপজানকে, সন্তানের সঙ্গে দূরত্ব রাখতে। আলি যখন মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন, ইচ্ছে করেই সংক্ষিপ্ত এবং রুঢ় হন, পাছে স্নেহ প্রকাশ পেয়ে যায়। নাহার ভালো করেই জানে, আলি নিজে থেকে মেয়ের ঘরে যাবেন না, বা এ ঘরে ডাকবেন না। তাই চ্যালেঞ্জটা। ছুঁড়ে দিয়ে আলির অস্বস্তি সৃষ্টি করে তার এক ধরনের জিৎ হয়ে যায়। সোনালি সেই আভায় উজ্জ্বল হয়ে যায় সে। মনটাও স্বামীর অনুগত হয়ে যায় আবার কয়েক মুহূর্তের বিচ্যুতির পর।

নাহার বলে, তোমাকে আর মেয়েকে এক সঙ্গে চা দিচ্ছি। খেতে খেতে চট করে কথাটা বলে কাজে চলে যাও। বাকি আমি দেখব।

ডাঃ ভাইয়ানের কথা শুনে দেখার আগেই তাকে খুব পছন্দ হয়েছে নাহারেরও। তাছাড়া, তার মনের মধ্যে কিছুদিন থেকেই এ আশংকাটা দেখা দিয়েছে, ইয়াসমিন হয়তো

লাগাম। ছাড়া হয়ে যাবে। বয়স না হয় সতেরই হলো, বাড় কুড়ি-একুশের, এখন একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে নাহার নিশ্চিন্ত হতে পারে।

যাই, তোমার মেয়ে হয়তো এখনো ঘুমুচ্ছে।

ডাক্তার আজ আসছে যখন জান, কাল পার্টিতে যেতে দেয়া ঠিক হয় নি।

তাহলে আজ আর দেখতে হতো না।

নাহার মেয়ের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

শোন।

নাহার ফিরে দাঁড়ায়।

এক কাজ কর না হয়। আলি ইতস্তত করে বলেন, আমি আপিসে গিয়ে বসছি। তুমি মিনাকে চা দিয়ে পাঠাও। আপিস খুলতেও দেরি হয়ে যাচ্ছে। এক ক্লায়েন্ট আসবার কথা। বলে তিনি আর এক মুহূর্ত দাঁড়ান না। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যান।

২. তিনটে শোবার ঘর

ওপরে, তিনটে শোবার ঘরের সবচেয়ে ছোট ঘরখানা বড় মেয়ের, মানে ইয়াসমিনের। মাঝারি ঘরে থাকে মাহজাবীন আর নাসরিন। আলিদের শোবার ঘরটা বড়, কেউ এলে

সেখানেই বসবার ব্যবস্থা। নাহার গিয়ে ইয়াসমিনের দরোজায় টোকা দেয়।

এই অভ্যাসটি বহু কষ্টে মাকে শিখিয়েছে ইয়াসমিন। আগে তো হুট করে ঢুকে পড়ত নাহার, প্রতিবারই ইয়াসমিন এমন করে উঠত যেন তার গায়ে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তিড়িং বিড়িং করে লাফাত আর চাচাত। নাহার বুঝতেই পারত না, মেয়ের ঘরে মা ঢুকবে তার আবার নোটিশ কীসের? মেয়ে কি পর? না, মা পেটে ধরে নি তাকে? শেষে মেয়ের জেদে পড়ে অভ্যাসটা করে নিয়েছে সে। তাও মাঝে মধ্যে ভুল হতো। সেটা একেবারেই শুধরে যায়, যখন ইয়াসমিন তার এক জন্মদিনে ক্লাশের একগুচ্ছ বান্ধবীর সমুখে বলে বসল, তারা এখন নিজেদের ভেতরে গল্প করবে, মা যেন জানান না দিয়ে ঘরে না আসে, যেমন তার অভ্যেস।

দরোজায় আবার টোকা দেয় নাহার।

ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

কাল কত রাতে ফিরেছে? কাল ওর এক বান্ধবীর জন্মদিন ছিল। কয়েকজন মিলে সিনেমা দেখবে, তারপর চাইনিজ টেক-অ্যাওয়ে খাবার এনে বান্ধবীর বাসায় খাবে, একটু হৈ-চৈ করবে, ফিরে আসবে। কতই বা রাত হতে পারে? সাড়ে বারোটা পর্যন্ত নাহার নিজেই জেগেছিল। ইয়াসমিনের দেরি দেখে একটু ভাবনা হয়েছিল তার, কিন্তু প্রকাশ করলে স্বামী তুলকালাম করে ছাড়তেন। তাই সে ঘুমন্ত আলিকে আর জাগায় নি। তারপর নিজেও সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এর আগেও কয়েকবার এ রকম দেরি করেছে, চাবি দিয়ে দরোজা খুলে পা টিপে টিপে ওপরে এসেছে। নাহার কিছু বললেই বলেছে, তাকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে, তার সব বান্ধবীই এ স্বাধীনতা পায়, তাছাড়া বয়স ষোল হয়ে যাবার পর মানুষের স্বাধীনতা আছে যতক্ষণ খুশি বাইরে থাকবার, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে মা কিম্বা যেই হোক মাথা গলানোটা অশালীন।

নাহার এবার নাম ধরেই ডাকে।

মিনা।

তবু সাড়া পাওয়া যায় না।

মেয়ের কাছে তিরস্কৃত হবার আশংকার চেয়ে উদ্বেগটাই লাফ দিয়ে প্রকাণ্ড হয়ে যায়।

হাতল ঘোরাতেই দরোজা খুলে যায়, দরোজা খুলে দেখা যায়, ইয়াসমিন বিছানায় নেই। নেই, তবু বিশ্বাস হয় না। চোখের ভুল বলে মনে হয়। ছোট্ট এতটুকু ঘর–একবারেই

চোখে সবটা মেপে নেয়া যায়। ঘর শূন্য। বিছানা অগোছালো। হয়তো রাতে কেউ ঘুমিয়েছিল, হয়তো কেউ ঘুমোয় নি, বোঝা যায় না। ইয়াসমিন বিছানা করতে বড় আলসে। যেমন ঘুম থেকে উঠে যায়, তেমনি রাতে এসে বাসি বিছানায় শুয়ে পড়ে। নাহার কিছু বললে খেপে ওঠে। বলে, সে কি হলওয়েল কারাগারে বন্দি যে রোজ ভোরে ওয়ার্ডেনের রোদে বেরুবার আগেই তাকে বিছানা করে রাখতে হবে, রেখে বিছানার পাশে নিষ্পাপ। সন্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

ইয়াসমিন কি তাহলে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেছে, নাহার টের পায় নি?

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বাথরুম দ্যাখে। কেউ নেই ভেতরে।

তখন মাঝের ঘর, অন্য দু মেয়ের যৌথ শোবার ঘরে আসে নাহার। ছোট মেয়ে নাসরিন শুয়ে শুয়ে চার্লি ব্রাউন কমিক বই পড়ছে। আর মাহজাবীন জানালার কাছে টেবিলের ওপর বসে, জানালার বাইরে মুখ করে নোখের রঙ ওঠাচ্ছে। ঘরে আর কেউ নেই। নাহারের পায়ের শব্দে দু মেয়ের কেউ ফিরে তাকায় না। ইয়াসমিনকে এখানেও না দেখে তার বুক হিম হয়ে যায়।

কিছুতেই সত্যি বলে মনে হয় না, ইয়াসমিন গত রাতে ফেরে নি।

মাথাটা ঘুরে উঠে একবার। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে নাহার। শূন্য দৃষ্টিতে ইয়াসমিনের পিঠোপিঠি মেয়ে মাহজাবীনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর মাহজাবীন নোখের রঙ তুলতে তুলতেই বলে, মাম, আজ প্রাতরাশ খাইতে চাহি না। প্লিজ।

প্রায় ছুটির দিনেই মাহজাবীন ভোরে নাশতা করতে আপত্তি করে।

সপ্তাহের পাঁচদিন ভোরে ইস্কুলে যাবার আগে মায়ের কড়াচোখের নিচে বাটি ভর্তি দুধ সিরিয়েল গিলতে হয়, ছুটির দিনে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা দেখায় সে। এটা নতুন নয়। তবু, নাহারের মনে হয়, আজ এর বিশেষ একটা অর্থ আছে।

সে মেয়েকে বলে, কখন উঠেছিস ঘুম থেকে?

মাহজাবীন আপন কাজে ব্যস্ত থাকে। নোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্যাখে। জবাব দেয় না।

নাহার কিছুটা কঠিনস্বরে জিগ্যেস করে এবার–উঠেছিস কখন?

ছোট মেয়ে নাসরিন চার্লি ব্রাউনের বইয়ের দিকে তাকিয়েই বলে ওঠে, আহ তোমরা কী শুরু করিলে বল তো? আমাকে পড়িতে দাও।

নাসরিনকে পড়বার অখণ্ড নীরবতা দেবার জন্য নয়, ভিন্ন কারণে নাহার মাহজাবীনকে বলে, বীনা, এদিকে শুনে যাও।

মাহজাবীন ভ্রু কুঁচকে মায়ের দিকে তাকায়।

প্রাতরাশ নয়, প্লিজ।

এসো এদিকে।

নাহারের গলায় কী ছিল, মাহজাবীন টেবিল থেকে নেমে আসে।

পাশেই ইয়াসমিনের ঘর, দরোজা খোলা, ভেতরে ঢুকে দরোজাটা বন্ধ করে নাহার সরাসরি প্রশ্ন করে, মিনা কোথায়?

ঘরের চারদিকে ধীর চোখে মাহজাবীন তাকায়। নাহার রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে। পিঠোপিঠি বোন, হয়তো ছোটটি বড়-র গতিবিধি জানে। তার এক প্রকার বিশ্বাসও হয়, মাহজাবীন নিশ্চয়ই জানে।

গুডনেস, সে কি ফিরিয়া আসে নাই?

তাহলে আর তোমাকে জিগ্যেস করছি কেন?

মাহজাবীন বড় বড় চোখে মায়ের দিকে তাকায়।

আমি জানিব কী প্রকারে?

তুমি জানবে না তো কে জানবে? রাতদিন তোমাদের কথাবার্তা, হাসাহাসি।

তাহাতে কী? তাহার গোপনীয়তা তাহার কাছে।

কাল কার জন্মদিন ছিল?

আমি জানি না?

কিছু বলে নি?

আমার স্মরণ হয় না।

কোথায় যেতে পারে জানিস?

তাহার বন্ধুরা আমার নহে। অমি সংবাদ রাখি না।

নাহার গুম হয়ে যায়। একবার মনের ভেতরে চমক দিয়ে যায়, মাহজাবীন জেনেও গোপন করছে না তো? কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে নিষ্পাপ মনে হয়।

চোখের ওপর। নোখ তুলে ধরে সে এখন নিরিখ করে দেখছে, রঙ ঠিকমতো উঠেছে কিনা।

ইয়াসমিনের শূন্য বিছানার ওপর বসে পড়ে নাহার।

বীনা।

মাহজাবীন মায়ের আতংকিত কণ্ঠস্বরে চোখ ফেরায়। রক্তশূন্য মুখটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে আন্দোলিত হয় সে। তারপর, আবার সে স্থিরতর হয়।

মাম, এমনও কি সম্ভব নহে ফিরিয়াছিল সত্য, প্রভাতে আবার বাহিরে গিয়াছে।

অনুমানটি লোভনীয় মনে হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। বিশ্বাস করে নাহার, কিন্তু পর মুহূর্তেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

না, আমি খুব ভোরে উঠেছিলাম। বেরিয়ে গেলে টের পেতাম।

তবে আমি আর জানি না।

তোর বাবাকে এখন কী বলব?

বলিবে, প্রভাতে বাহির যায়। তোমাকে বলিয়া যায়। অথবা তুমি সাড়া পাইয়াছিলে।

মাথা নাড়ে নাহার।

না, তাকে আমি বলেছি, মিনা ঘরে আছে।

ভ্রূ কুঁচকে মায়ের দিকে তাকায় মাহজাবীন।

ড্যাডি সহসা কেন সন্ধান করিলেন?

আজ সেই ডাক্তার আসবে, বিকেলের দিকে। মিনা তোকে কিছুই বলে নি? তুই একটুও টের পাস নি?

সত্য, মাম।

কিছু যদি বলে থাকে, আমাকে বল।

জানিলে বলিতাম।

বোন ঘরে ফেরে নি, শুনে এত ঠাণ্ডা আছ কী করে?

নাহার তিরস্কার করে মেয়েকে।

মাহজাবীন ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বলে, তাহার জীবন তাহার।

৩. ইয়াসমিন চা নিয়ে আপিস ঘরে এলো না

অনেকক্ষণ পরেও যখন ইয়াসমিন চা নিয়ে আপিস ঘরে এলো না, মিস্টার আলি বিরক্ত বোধ করেন। মেয়েটির কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই বাবা-মায়ের জন্য। বয়স সতের পুরো হয় নি, লেখাপড়া শেষ হয় নি, খাওয়া-পরা-জামা-কাপড়ের জন্য এখনো নির্ভরশীল, অথচ চলন দেখলে মনে হবে, কোনো এক অধিকার বলে বাবা মায়ের কাছ থেকে কর আদায় করে চলেছে, বাবা-মাকেই তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে।

আলি পেছনের দরোজার দিকে একবার তাকাল। দরোজার ওপারেই সিঁড়ি। সিঁড়িতে এখনো কোনো পায়ের শব্দ নেই।

যে বাঙালটি তাকে ফাঁকি দিয়েছে, মিস্টার খানকে ব্যবসা দিয়েছে, তার জিনিসের খসড়া তালিকা টেবিলে কাগজপত্রের ওপরেই পড়ে ছিল। আলি এখন সেটা নিয়ে ফাস করে ছিঁড়ে ফেলেন। বাঙালিদের দেশপ্রেম সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়ে, মনে মনে গোটা বাংলাদেশেরই ভবিষ্যত অভিশপ্ত বলে স্থির করেন।

তালিকাটি ছিঁড়ে ফেলবার পর দ্বিতীয় যে কাগজটি সমুখে মেলে থাকে, তাতে সব বড় হাতের অক্ষরে লেখা মি. বজলুল করিম, লন্ডন-ঢাকা-লন্ডন, আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে যে-কোনো দিন। প্রথমে মনে পড়ে না। তারপর হঠাৎ লক্ষ হয়। ভদ্রলোক আজই আসবেন টিকিট নিতে। দেশে যাচ্ছেন। আলি তালিকাভুক্ত এজন্ট নন বলে তাকে নগদ টাকায় বিমান-আপিস থেকে টিকিট এনে খদ্দেরকে দিতে হয়। মিস্টার করিমের টিকিট

এখনো আনা হয় নি। ভদ্রলোক বিকেলেই এসে হাজির হবেন। ঘড়ি দেখেন আলি। বিকেলে ডাঃ ভাইয়ান আসবে, কখন আসবে ঠিক নেই, ম্যানচেস্টার থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছে। টিকিট আনতে হলে এখন বেরুনোই ভাল। তিনি কি একবার ওপরে যাবেন? নাহারকে বলবেন। আপিস লক্ষ রাখতে? অজুহাতটা ভালো লাগে তার। ইয়াসমিন আসতে দেরি করছে কেন, ওপরে গিয়ে সেটাও যাচাই করা যাবে।

আলি উঠতে যাবেন, পেছনে শব্দ পাওয়া গেল।

নাহার।

জিজ্ঞাসু চোখে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকান। প্রশ্নটা এই, ইয়াসমিনের না চা নিয়ে আসবার কথা?

নাহারকে ইতস্তত করতে দেখে আলির মাথায় রক্ত চড়ে যায়। মেয়েটি নিশ্চয়ই বিয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিচে নামে নি।

ইয়াসমিন কই?

আলি প্রায় সব সময়ই মেয়েদের পুরো নাম ধরে ডাকেন। এখন তো ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন।

তুমি না বললে তাকে পাঠিয়ে দেবে?

সে নেই।

নেই?

মানে বাড়িতে নেই।

বাড়িতে নেই মানে কী? বাড়িতে থাকবে না কেন? এই ভোরে ভোরে আবার কোথায় গেছে?

বোধহয় সে বাড়িতেই ফেরে নি।

চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কথাটার অর্থ মর্মে প্রবেশ করে। নেতানো গলায় প্রতিধ্বনি করেন তখন, বাড়িতে ফেরে নি।

মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন আলি। তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকান। মুহূর্তের জন্যে নাহারকেও তার অচেনা মনে হয়।

নাহার প্রস্তুত হয়ে থাকে স্বামীর যে-কোনো অভিযোগ, যে-কোনো চিৎকার শুনবার জন্যে।

সে জানে এক্ষুণি তিনি সমস্ত দোষ তাকেই দেবেন।

তার বদলে আলি দুঃখিত গলায় উচ্চারণ করেন, কোনো দিন তো এ রকম করে নি।

মেয়ের কুশলের চেয়ে পারিবারিক মর্যাদাহানীর আতংক আলির মাথায় বড় হয়ে থাকে। এবং ক্রমশ তা আরো বড় হয়।

এর অর্থ ভেবে দেখছ?

আমিও তো ভাবি নি, মিনা এ বলবে।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে আলি উঠে দাঁড়ান। সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে চলে যান। ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে ডাকেন, মাহজাবীন।

সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে আসে। আপাদমস্তক তাকে একবার দেখে নেন আলি। মেয়েটি এখনো রাতের শোবার পোশাক ছাড়ে নি। বুকের কাছে বোতামটা লাগিয়ে সে নীরবে অপেক্ষা করে।

আলি সরাসরি প্রশ্ন করে, ইয়াসমিন কোথায় বলিতে পার?

মাহজাবীন মাথা নাড়ে।

আমার সহিত আইস।

নিজের শোবার ঘরে আলি ঢুকে যান। মাহজাবীন তবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের ভেতরে যায়।

আসন লও।

মাহজাবীন কতটা ভয় পেয়েছে বলা যায় না। বড় বড় চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে সে বসে পড়ে। বসবার পরও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় না।

আলি কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়ে থেকে বলেন, আমার ধারণা তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ।

চমকে মাহজাবীন বাবার দিকে তাকায়।

মিথ্যা নহে।

লুকাইও না। তোমরা শিশু। তোমরা ভবিষ্যত জান না। তোমাদের ভালোর জন্যেই বলিতেছি। আমাকে বল, ইয়াসমিন কোথায় গিয়াছে?

আমাকে বলে নাই।

সত্য?

সত্য বলিতেছি।

মাহজাবীনের দিকে আবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকান আলি। পনের বছরের এই মেয়েটির পক্ষে পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলা সম্ভব কিনা, তাও বাবার জেরার মুখে, মনে মনে আলি আন্দোলন করেন। এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হন, মাহজাবীন মিথ্যে কথাই বলছে।

মাহজাবীন আমার দিকে তাকাও।

মেয়েটি চোখ তুলে পরক্ষণেই নামিয়ে নেয়।

আমার বিশ্বাস, ইয়াসমিন হইতে তুমি ভিন্ন। তুমি তাহার মতো নও। পিতামাতাকে তুমি শ্রদ্ধা কর, বাঙালি মেয়ের শালীনতাবোধ তোমার আচরণে আমি লক্ষ করিয়াছি। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার ভগ্নি আমাদের প্রত্যেকের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে?

মাহজাবীন চুপ করে থাকে।

তুই নিশ্চয় জানিস, ইয়াসমিন কেথায়? বল আমাকে, তোকে না বললেও, তুই নিশ্চয়ই কখনো কিছু শুনেছিস। একদিন হঠাৎ এ রকম কেউ করে না। বল আমাকে, কিছু মনে পড়ে তোর?

মাহজাবীন অন্তত এটুকু খুশি হয় যে, বাবা মনে মনে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে বলার অভিযোগটা তুলেই নিয়েছেন। নইলে এভাবে এখন মিনতি করতেন না।

মেয়ের পাশে এসে বসেন আলি।

কিছু কি মনে পড়িতেছে?

না ড্যাডি।

কিছুই কি মনে পড়ে না? ফোনে কোনো আলাপ? পত্র? অথবা, তাহার এমন কোনো বন্ধু এইরূপ বুদ্ধি জোগাইতে পারে?

বন্ধুর উল্লেখ করে নিজেই শিউরে ওঠেন আলি। তিনি একাধিক ইংরেজ তরুণের কণ্ঠ মনে করতে পারেন, যারা টেলিফোনে ইয়াসমিনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। বাড়ির টেলিফোনই আপিসের বলে, তিনি মেয়েদের কাউকে খুব বেশি ফোন ব্যবহার করতে দিতেন না। আলি জানেন, নির্দেশটা মেয়েদের বন্ধুরাও নিশ্চয়ই জানে। তা সত্ত্বেও যখন

ফোন আসে, তখন খুব দরকারেই আসে, তা বোঝা শক্ত নয়। সেই দরকারটা কী? এমন কিছু যা তিনি জানতে পারেন নি কখনো।

মাহজাবীন?

আমি কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না?

গুরুত্ব উপলব্ধি কর?

হাঁ, ড্যাডি?

সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে?

না, ড্যাডি?

মাহজাবীন নিজেই খুশি হয়ে যায় উত্তরটা সাবলীলভাবে দিতে পারবার কৃতিত্বে। সমাজের উল্লেখে মাহজাবীনের সমুখে বাঙালি কিছু দম্পতির চেহারা ভেসে ওঠে, যারা, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, পাউন্ড জমায়, আনন্দ করে না, গান শোনে না, কারি রান্না করে, আঞ্চলিক বাংলা বলে যার অধিকাংশই তার বোধগম্য হয় না এবং যে-কোনো বাড়িতে গিয়ে বাড়ির দাম কতটা বাড়ল, কেথায় সুলভে কী পাওয়া যাচ্ছে, নতুন সামগ্রীটি কবে

কত দামে কেনা হলো, এ আলোচনায় ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দুপুররাতে ঢেকুর তুলে বাড়ি ফেরে। এদের কাছে মুখ দেখাতে না পারল তো বয়েই গেল তার।

মনের ভেতরে খিকখিক করে হাসে মাহজাবীন। বোধহয় তার কিছুটা চোখে মুখে প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

আলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, তুমি এখনো শিশু। তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ইয়াসমিন আমাকে সাগরে নিমজ্জিত করিল। ডাক্তার আসিলে তাহাকেই বা কী বলিব? যথাসম্ভব করুণ ও দুঃখিত চেহারা তুলে মাহজাবীন বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

৪. ম্যানচেস্টার থেকে নটার দিকে

ম্যানচেস্টার থেকে নটার দিকে রওয়ানা দিয়েছে ডাঃ ইউনুস ভাইয়ান। স্কটল্যান্ডের বেলশিলে কাজ করে সে, সেখানকার মাতৃসদন হাসপাতালে। একটানা চলে আসতে পারত লন্ডনে গাড়ি চালিয়ে। বহুবার লন্ডনে সে বেড়াতে এসেছে সোজা কোথাও না থেমে। এ যাত্রায় ম্যানচেস্টারে থেমেছিল ডাঃ বারীকে তুলে নেবার জন্যে। তার সঙ্গে শলা হয়েছে, দুজনে দুটো দিন লন্ডনে থাকবে, তারপর ভাইয়ান তাকে নামিয়ে দিয়ে বেলশিলে ফিরে যাবে।

আসলে, এ যাত্রায় মেয়ে দেখতে বেরিয়েছে, বারীকে তা বলে নি ভাইয়ান। বলেছে ছুটি করতে যাচ্ছে, সে আসবে কিনা।

মোটরওয়ে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক একটানা চলবার পর চায়ের তৃষ্ণায় এক সার্ভিস স্টেশনে ঢুকে পড়ে তারা। গাড়ি পার্ক করে রেস্তোরায় গিয়ে কাউন্টার থেকে চা আর স্যান্ডউইচ নিয়ে বসে তারা। মোটর পথের আরও বহু যাত্রী তাদেরই মতো চা কফি খেতে ভিড় করেছে। দুই বন্ধু চা খেতে খেতে তরুণী শ্বেতাঙ্গিনীদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, কিছুক্ষণ দ্যাখে, দৃষ্টি তৃপ্ত হলে, অথবা, তরুণীটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে চোখ ফিরিয়ে আবার অন্য কাউকে সন্ধান করে। কাঁধে যাযাবর-পোটলা নিয়ে দুটি তরুণী কাউন্টারে খাবার কিনছে। দুজনের রুখু লাল চুল। পরনে জীনস, অসংখ্য তালিমারা, গায়ে আর্মি সারপ্লাস সোয়েটার ঢল ঢল করছে। একজনের হাতে গিটার। তরুণী দুটি চা গোল রুটি নিয়ে ঠিক ভাইয়ানদের পাশেই বসে।

কাছে এসে বসতেই প্রথম দুই বন্ধুই চোখ ফিরিয়ে নেয় দ্রুত। যেন–না, তোমাদের দেখছিলাম না। তারপর আবার তারা মনযোগ দেয় তরুণী দুটির দিকে। তারা স্তিমিত চোখে তাকিয়ে দ্যাখে পাটলবর্ণ মানুষ দুটিকে। চোখে চোখ পড়বার সংকোচ তাদের নাই। ডাঃ বারী নিজের টাকে হাত রাখে, দ্রুত টাক বুলিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নেয়। এই তার এক মুদ্রাদোষ। কেউ তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই টাকে হাত চলে যায়।

বারী বলে, ডাক্তার সাহেব, আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভাইয়ান সেটা জানে। কিছুটা খুশিও হয়। বলে, দেখতে মন্দ না।

একটিকে তার পছন্দ হয়, যার হাতে গিটার নেই। বয়সটা অপরের তুলনায় কিছু বেশি, মুখটা পুরুষালি, হাতের পাঞ্জা শক্ত সমর্থ। তার সঙ্গিনীটি প্রায় ছেলেমানুষ, মেয়ে-মেয়ে ভাবটা তার অত্যন্ত স্পষ্ট। তাকে আবার ডাঃ বারীর বেশ ভালো লাগে। টাকের কথা ঘনঘন বেয়াড়া রকম মনে পড়ে যাচ্ছে দেখে নিজেই সে বুঝতে পারে, ভেতরে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

বারী আর ভাইয়ান একসঙ্গেই চায়ের কাপে মুখ নামিয়ে আনে। তারপর দুজনেই মুখ তুলে, একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

বারী বলে, কিছু বুঝতে পারলেন?

না।

কিছু না?

হিচহাইক শব্দটা উচ্চারণ করলে তরুণীরা বুঝে ফেলতে পারে, ভাইয়ান তাই বাংলা করে বলে আঙুল দেখিয়ে গাড়ি থামায়, আর কী? গানটান গায়। বেড়াবে বেরিয়েছে। দেবেন নাকি লন্ডন পর্যন্ত একটা লিফট?

লিফট শব্দটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতেই ভাইয়ান সচকিত হয়ে পড়ে। বুঝে ফেলল না তো?

তো বারী বলে, দুর সাহেব, লিফট দিয়ে লাভ নেই। বুঝতে পারছেন না? এরা সমকামী।

ভাইয়ান কৌতুক চোখে তরুণী দুটিকে দ্রুত দেখে নেয় একবার।

কী যে বলেন?

হাঁ, নির্ঘাত। বড়টি সক্রিয়, ছোটটি নিষ্ক্রিয়। কষ্ট করে বাংলা শব্দ হাতড়ে মনে করে বারী তার অভিমত জ্ঞাপন করে।

পেয়ালা নামিয়ে রাখে ভাইয়ান। বলে, নিন, উঠুন। পথে কেমন ভিড় দেখছে না? পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে।

বারী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, হাঁ, শনিবার তো। কী অপচয়!

শেষ কথাটি ঠিক বুঝতে পারে না ভাইয়ান।

কীসের অপচয়?

মেয়েটির কথা বলছি। সমকামী একটি রমণী অন্তত একটি পুরুষকে বঞ্চিত করিতেছে, দুইটি বঞ্চিত করিতেছে দুই জনকে।

নিরাপদ দুরত্বে এসে গেছে বলে বারী বাক্যটি ইংরেজিতে শেষ করবার সাহস পায়।

বেরুবার আগে কিছু চকোলেট আর চুয়িংগাম কেনে তারা। পথে গাড়ি চালাতে চালাতে খাওয়া যাবে। ভাইয়ান বলে, আপনার কি ফাঁকা যাচ্ছে নাকি?

বারী হাসে। বেরুবার দরোজা খুলে ভাইয়ানকে আগে বেরুতে দেয়। বলে, এখন একটু সাবধান হতে হয়। সেদিন দেখলেন না, ইন্ডিয়ান এক ডাক্তার কীভাবে তার রেজিস্ট্রেশন হারাল?

ভাইয়ানের মনে পড়ে যায় খবরটি। মহিলা এক পেশেন্টকে দেহ পরীক্ষার ছলে নাকি ডাক্তারটি দেহভোগ করেছে। তারপর নালিশ, মামলা। পরিণামে বিলেতে প্র্যাকটিস করা তার বন্ধ।

সার্ভিস স্টেশনের খোলা চত্বর পেরিয়ে গাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাইয়ান বলে, আপনি তো আর পেশেন্টের সঙ্গে কিছু করতে যাচ্ছেন না।

তবু বলা যায় কি? এ দেশে আমাদের ওরা চায় না। কখন কে বলে বসবে, আমি পেশেন্ট ছিলাম, আমাকে ইয়ে করেছে, ব্যাস, হয়ে গেল। কিছু না হোক, বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে।

তো করবেন। আপনি তো বিয়ে করেন নি।

বারী বলে, ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে? বারোজনের জিনিসকে বিয়ে করে কে সাহেব? করলে তো কবেই করতে পারতাম।

বিয়াল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে ডাঃ বারীর, এখনো অবিবাহিত। তার বক্তব্য, মনের মতো

মেয়ে এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি। অন্য ডাক্তারেরা বলে, বারীর নিকষ কালো চেহারা, তার ওপরে ছেলেবেলার গুটি বসন্তের দাগ, কোনো মেয়ে পছন্দ করে নি তাকে। বারী যে বছরে একবার নিয়মিত দেশে যায় এক মাসের জন্যে, লোকে বলে, গোপনে সে মেয়ে দেখে বেড়ায়। প্রতিবারই হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

গাড়ির কাছে এসে বারী বলে, ডাক্তার সাহেব, এবার আমি চালাই।

ম্যানচেস্টার থেকে চালিয়ে এসেছিল ভাইয়ান, এবারে বারী গিয়ে হাল ধরে।

পথের ওপর আবার গাড়ি উধ্বশ্বাসে ছুটে চলে লন্ডনের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাবার পর ভাইয়ান ইতস্তত করে বলে, বারী সাহেব, আপনি শুনলে তো আবার রাগ করবেন, আগে বলি নি কেন?

পথের দিকে চোখ রেখে বারী ভ্রু কুঁচকে রাখে।

ভাইয়ান বলে, লন্ডনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

নতুন কোনো হাসপাতালে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন নাকি? ও আশাও করবেন না। স্কটল্যান্ডের ডাক্তারদের ইংল্যান্ডে সহজে কাজ হয় না। সে ইংরেজই হোক, আর আমরাই হই।

ভেতরের কথাটা বলতে গিয়েও ইতস্তত বোধ করে ভাইয়ান। একটু লজ্জাও করে। তাই সে আপাতত সেটাকে চাপা দিয়ে নগদ প্রসঙ্গেরই জের টেনে বলে, জানি। পাকিস্তানিদের আমরা বলতাম ইস্ট পাকিস্তানকে দাবিয়ে রাখে, এখানেও কম নয়। যতবার লন্ডন থেকে গাড়িতে করে ফিরে গেছি স্কটল্যান্ডে, বোঝাই যায় কখন স্কটল্যান্ডে ঢুকে পড়েছি। রাস্তাগুলো গরীব, সার্ভিস স্টেশনগুলো বাজে, বাড়িঘর সাধারণ। তফাতটা স্পষ্ট বোঝা যায় ইংল্যান্ড থেকে। তাই না?

স্কটল্যান্ড তো এখন স্বাধীন হবার কথা ভাবছে। নর্থ সি-তে তেল বেরিয়ে গেছে, আর ঠেকায় কে?

একটা জিনিসের জন্যে আমার অবাক লাগে, এদের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। স্বাধীনতার কথা এরা খোলাখুলি বলতে পারছে, আর আমাদের দেশে বললে ফাঁসি। মিথ্যে একটা মামলাই করে দিল শেখ মুজিবের নামে আইয়ুব খাঁ।

ইংরেজও করে। নিজের দেশে বলে মুখোশটা ঠিক রেখেছে। ব্রিটিশ আমলে আমাদের দেশে কম করেছে সাহেব? আইয়ুব খাঁ তো তাদেরই ট্রেনিং পাওয়া। হঠাৎ মনে পড়ে যায় বারীর। মুহূর্তের জন্যে পথ থেকে চোখ ফিরিয়ে ভাইয়ানকে দেখে নিয়ে, আবার সমুখে চোখ রেখে বলে, কই বললেন না তো, লন্ডনে আপনার উদ্দেশ্যটা? তাহলে নির্জলা ছুটি নয়?

রুহুল কুদ্দুসকে চেনেন তো? সেই যে সেভেন্টি-ফোরে ডাবলিনে পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখা হলো। এক চান্সে এম-আর-সি-ও-জি হয়ে গেল?

খচ করে বুকের ভেতরে লাগল কথাটা। বারী বহু বৎসর ধরে পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারে নি। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

হাঁ, মনে আছে।

রুহুল কুদ্দস এক মেয়ের খবর দিয়েছে।

মেয়ে?

বাঙালি মেয়ে। বাবা-মা অনেকদিন এদেশে আছে। বাবার ট্রাভেল এজেন্সি আর দেশে মাল পাঠাবার ব্যবসা।

দ্রুততম তৃতীয় লেন ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ধীর গতির প্রথম লেনে গাড়ি সরিয়ে আনে বারী। মেয়ে দেখেছেন?

না, সেই দেখতেই যাচ্ছি। আমিও আপনার মতো ডাক্তার সাহেব, বিয়ে বাঙালি ছাড়া করব

না। রুহুল কুদুস বলল, মেয়েটি নাকি ভালো। বাবা-মা দুজনে বহুদিন এসে থাকলেও এখনো পুরোদস্তুর বাঙালি। তা রুহুল কুদুস আবার থাকতে পারছে না, তার কী কাজ আছে। তাই আপনাকে নিয়ে এলাম। একটা ওপিনিয়ন দিতে পারবেন। অনেকদিন তো আমাকে চেনেন, আমার সবই আপনার জানা। কী রকম বৌ চাই, আপনি ভালো বুঝবেন। বারী আবার ধীরে ধীরে তৃতীয় লেনে গাড়ি নিয়ে যায়। যেতে যতক্ষণ লাগে সে কিছু বলে না। তারপর দ্রুত গতিতে স্থির হয়ে বলে সেই মেয়েটির কী হলো?

অ্যান?

চুপ করে থাকে বারী। অপেক্ষা করে উত্তরের জন্যে।

ভাইয়ান বলে, ডাঃ খলিলের কথা মনে আছে? হার্ট উড হাসপাতালে ছিল, সেখানে নার্স বিয়ে করেছিল, ক্যাথি নাম?

হাঁ।

বিয়ের পর খলিলের অবস্থা দেখে আমার আর ইংরেজ বিয়ে করবার সাধ নেই। দেশে টাকা। পাঠান তো বন্ধই করেছে, দেশেও যায় না আজ তিন বছর। দেখলে আর চিনতে পারবেন না খলিলকে। পাকা ইংরেজ। আমাদের এখন যে সব শুনতে হয়, শুনে মনে হয়, বাংলাদেশে তার জন্ম নয়। অ্যা

নের সঙ্গে তো বেশ ঘুরতেন। একবার বললেন না, ভালোবাসেন?

ভাইয়ান লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে, পা সমুখে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বাধা পেয়ে, পা আবার গুটিয়ে বলে, সে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরলে ও রকম মনে হয় ডাক্তার সাহেব। তাছাড়া দেখুন না, দেশে কোনো ডাক্তার নার্স বিয়ে করলে ছি ছি পড়ে যায়, ডাক্তারেরাই যেন এক ঘরে করে রাখে। এখানে শাদা চামড়া বলেই নার্স উচ্চপদবাচ্য হয়ে গেল? অনেক ভেবে দেখলাম বারী সাহেব, নাহ, বিয়ে করলে বাঙালি। আমার অন্তত ও সব পোষাবে না। বিছানায় নিজের দুদিন ফুর্তির জন্যে সারা জীবন দেশ ছেড়ে, বাপ-মা ভাই-বোন ভুলে বেকড বীনস আর সসজে খেয়ে থাকতে পারব না।

সেই জন্যে বাঙালি মেয়ে খুঁজছেন?

হাঁ, তাই আর কী। রুহুল কুদ্দুসও খুব করে বলল। ভাবলাম দেখেই আসি। দেখতে ক্ষতি কী?

নিজের উদ্দাম আগ্রহ, বারীকে আগে থেকে জানান না দিয়ে টেনে আনবার জন্যে বিবৃতি, এক সঙ্গে সব চাপা দেবার জন্যে ডাঃ ভাইয়ান গলায় তাচ্ছিল্যের সুর আনে। যেন, নেহাত একটা মজা করতে যাচ্ছে, বিয়েটা কোনো কথাই নয়।

ডাঃ বারী হঠাৎ জিগ্যেস করে, আচ্ছা সেই রুহুল কুদ্দুস এখন কী করে?

লন্ডনে কিং এডোয়ার্ড হাসপাতালের কনসালট্যান্ট।

বুকের ভেতরে আবার খোঁচা অনুভব করে বারী। ম্যানচেস্টার থেকে তাকে মেয়ে দেখার জন্যে না বলে নিয়ে আনার দরুণ ভেতরটা হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে তার। নীরবে সে গাড়ি চালাতে থাকে।

৫. বজুলল করিম সাহেব আসবেন

দুপুরের পর যে-কোনো সময় বজুলল করিম সাহেব আসবেন ঢাকার টিকিট নিতে। টিকিট আনতে এক্ষুণি না বেরুলে নয়। মিস্টার আলি আপিস ঘরে ফিরে এসে শূন্য দৃষ্টিতে করিম সাহেবের নাম লেখা চিরকুটটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতক্ষণ নাহার আপিস ঘরেই বসেছিল। ঘর খালি রেখে যেতে পারে না। এখন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে বুঝে নেয়, মাহজাবীনের কাছ থেকে কোনো কিছু জানা যায় নি।

দাঁড়িয়ে না থেকে বোসো। ভয়ে ভয়ে নাহার বলে।

চেয়ারে বসে আলি দুহাতে মাথার দুপাশ ধরে পাথরের মতো বসে থাকেন। কী করবেন, কোন পথে এগোবেন, কিছুই ভেবে পান না। তার স্ত্রীও চুপ করে বসে। তার এই চুপ করে থাকাটা আলিকে বরং ক্ষিপ্তই করে তোলে।

বসে আছ কী করতে? যাও সারা লন্ডনে বলে বেড়াও তোমার মেয়ের কীর্তি। তারা বাহবা দেবে।

নাহার কিছু বলে না।

বারবার বলেছি, দেশ থেকে বই আনিয়ে দিয়েছি, কতবার তোমাকে বলেছি, মেয়েদের নামাজ পড়া শেখাও, আদব কায়দা শেখাও। আরবি অক্ষর শেখাও, সপ্তাহে অন্তত

একদিন বসে কোরান পড়ক। মেয়ে সেয়ানা হয়ে যায়, তোমার হুশ হয় না। ছিছিছি। লোকে কী বলবে?

নাহার মৃদুস্বরে বলে, কী জানি, বন্ধুর বাড়িতে রাত হয়ে গেছে বলে থেকে গেছে কিনা।

থেকে গেল বেলা দশটা পর্যন্ত? তার হুশ নেই, একটা ফোন করত না? আর ও রকম থাকবেই বা কেন?

মেয়ের বাইরে রাতবাস করবার কথা ভেবেও শিউরে উঠেন আলি।

এখন আবার আমার বিমান আপিসে যাওয়া দরকার।

নাহার উঠে দাঁড়ায়। বলে, মেয়ের দায়িত্ব আমার একার ছিল না।

তা কার ছিল? তোমার কাজটা কী শুনি মেয়ে লেহাজ-তমিজ মায়ের কাছ থেকে শিখবে। না কার কাছে শিখবে? ছেলে হলে আমাকে বলতে পারতে। মেয়ের দায়িত্ব মায়েদের। ছেলে তো জন্ম দিতে পার নি। তিনটে মেয়ে জন্ম দিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছ।

নীরবে নাহার আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শোন।

নাহার বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে।

আছ না গেছ?

শুনছি।

মেয়ের বন্ধু বান্ধব যারা আছে টেলিফোন কর। জিগ্যেস কর, কেউ জানে কিনা, কারো কাছে আছে কিনা। অন্তত এ কাজটা কর। যত দায়িত্ব আমার? মানসম্মান গেলে আমার যাবে, না, তোমারও যাবে?

মিস্টার আলি আপিসের দরোজা বন্ধ করে ক্লোজড লেখাটা সমুখে ঝুলিয়ে দেন। তারপর হঠৎ করে মনে পড়ে করিম সাহেব যদি আসেন?

দরোজা আবার খুলে ক্লোজড লেখা সরিয়ে আলি বলেন, আপিসে বোসো। ফোনটোন যা করতে হয় এখান থেকে কর। আমি ঘুরে আসি। এবার ব্যবসাটা লাটে উঠলেই মা-মেয়েতে শান্তি পাও।

হল থেকে কোট হাতে নিয়ে আলি দুমদাম করে বেরিয়ে যান।

নাহার নিচের তলা থেকেই ডাকে, বীনা।

মাম।

নিচে এসো!

মাহজাবীনের আগে নাসরিন নেমে আসে। আলির চেয়ারে নাহার এখন বসেছে। চেয়ারের হাতল ধরে নাসরিন বলে, মাম, বুবু কি চিরদিনের মতো চলিয়া গিয়াছে?

চুপ কর।

কেন চুপ করিব?

বড়দের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করিতে শিখেছ?

কী বলিতেছ? বুঝি না।

বুঝবে কেন? ভেতো বাঙালির মেয়ে বাংলা বুঝবে কেন?

নাসরিন এ কথার একবর্ণ বোঝে না। তার মাথায় যে কথাটা ঘুরছে, পরিষ্কার বলে ফেলে। মাম, বুবুর ঘর আমাকে দিতে হইবে। বীনাবুবুকে আমি পছন্দ করি না। তাহার সহিত বাস করিব না।

ওপরে যাও, রিনা।

মায়ের গম্ভীর আদেশ শুনে একটু হকচকিয়ে যায় নাসরিন। তারপর সামলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, দায় পড়িয়াছে।

এখন ঠিক আলির মতো ভঙ্গিতে নাহার দুহাতে মাথা ধরে বসে থাকে। চোখ বুজে বাস্তবতার বোধ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে অনেকক্ষণ ধরে। সফল হয় না। হাল ছেড়ে দেয়। হঠাৎ মনে পড়ে মাহজাবীন সাড়া দিয়ে এখনো আসে নি।

বীনা।

সে ডাক ওপর পর্যন্ত পৌঁছুলো কিনা, সন্দেহ হয়। উঠে দরোজা খুলে নাহার চিৎকার করে বলে, তুইও কি বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিস, হারামজাদি? তাই যা। ভালোমানুষ সেজে থাকিস, মনে করিস মা বোকা, মা কিছু বোঝে না? এইবার আমি হাড়ে হাড়ে বোঝাব। নেমে এসো নিচে।

ধীর পায়ে নেমে আসে মাহজাবীন।

প্যাড পরিবর্তন করিতে ছিলাম। ডাকিলেই কিছু সঙ্গে সঙ্গে আসা যায় না।

নির্লজ্জ। দুনিয়াকে জানান দিয়ে প্যাড বদলাও। মুখে আনতে শরম নাই। বেহায়া মেয়ে। মাহজাবীন বিস্মিত হয়।

ইহা জৈবিক ব্যাপার, ইহাতে লজ্জিত হইবার কী আছে? তুমি নারী নও? নারীত্বের কারণে তুমি লজ্জিত? কেন ডাকিতেছিলে?

রাগটা মনের ভেতরে পুষে রেখে দিতে হয়, একই সঙ্গে হতাশও বোধ করে নাহার। মেয়েদের মুখে হঠাৎ হঠাৎ এ সব কথা শুনে, একেক সময় তার মনে হয় না এরা তার পেটের মেয়ে।

নাহার বলে, মিনার বন্ধুদের ফোন নম্বরগুলো দে।

সে তাহার ঠিকানা-বহিতে আছে।

সে বই নিয়ে আয়।

সে উহা লইয়া গিয়াছে। উহা তাহার ঝুলিতে থাকে।

নাহার ভীষণভাবে পরাজিত বোধ করে।

মাম, তুমি কাঁদিতেছ?

টপটপ করে চোখের পানি পড়ে নাহারের। মোছার চেষ্টা পর্যন্ত সে করে না। যেন তার হাতও তার নিয়ন্ত্রণে নয়।

তুমি কাঁদিতেছ কেন?

৬. ইয়াসমিন আজ নবজন্ম গ্রহণ করিল

ভিনসেন্ট প্রস্তাব করে, প্রকৃতপক্ষে ইয়াসমিন আজ নবজন্ম গ্রহণ করিল। সে আমাদের মধ্যে। আসিল। আইস আমরা আনন্দ করি।

মেঝের ওপর বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পিটার তখন থেকে কোকোর গালে চুমো খাচ্ছিল। ভিনসেন্টের প্রস্তাব শুনে সে তার আনন্দময় কাজে ক্ষণকালের বিরতি দিয়ে বলে, তাহার পূর্বে জন্মগ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক।

কোকো পিটারের গালে চুমো দিয়ে সমর্থন জানায় এবং তার দুই উরুর ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে বলে, শীত করিতেছে। উষ্ণতা ধার লইতেছি।

পিটার কোমল হাতে কোকোকে ছাড়িয়ে এবার উঠে দাঁড়ায়। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ঘুরে ঘুরে সে বলে, বন্ধুগণ, ইয়াসমিন এখন জন্মগ্রহণ করিবে।

সকলে এমনকি ইয়াসমিন নিজেও হাততালি দিয়ে ওঠে।

উত্তম, উত্তম প্রস্তাব।

অলবানি স্ট্রীটের এই বিশাল তেতলা বাড়িটি বহুদিন খালি পড়েছিল। লন্ডনে এমন বহু বাড়ি আছে, কোনো কারণে খালি। প্রধান একটা কারণ, মালিক বেশি ভাড়ার আশায়

ফেলে। রাখে। আরেকটা বড় কারণ, পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে নতুন বহুতল দালান ওঠানোর অনুমতি পাওয়া নিয়ে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে টানাহেঁচড়া চলে, সেই অবসরে বাড়িটি থাকে খালি পড়ে।

কিছুদিন থেকে একটা হাওয়া বইছে। কিছু তরুণ-তরুণী, কিছু দম্পতি একসঙ্গে মিলে এই সব বাড়ি দখল করে বিনাভাড়ায় বাস করছে। তরুণ-তরুণীদের আধকাংশই এক ধরনের আদিম ও মৌলিক জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। এরা যতদিন পারে সরকারের কাছ থেকে বেকার ভাতা নেয়। যখন বেশি চাপ আসে একটা কোনো কাজ জুটিয়ে নেয়, রেস্তোরার কাজ, রাজমিস্ত্রির জোগানদারের কাজ, দেয়ালে রঙ বা কাগজ লাগাবার কাজ, বড়লোক বাড়ির বাগান পরিষ্কার রাখবার কাজ। বিধিবদ্ধ সামাজিক জীবন-যাত্রার প্রতি এদের চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা। যে-কোনো আচার বা আনুষ্ঠানিকতা এদের চোখের বিষ। একে অপরের জিনিস ভাগ করে ব্যবহার করে, প্রায়ই জোড়া পাতিয়ে নেয়; স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে, কখনো খায় কখনো খায় না। নিয়মিত গ্রহণের ভেতরে গাঁজা বা চরস জাতীয় কিছু।

ইয়াসমিনের বন্ধু এবং বান্ধবীদের ভেতরে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যে কয়েকজন, তারা সকলেই। একে একে লেখাপড়া ছেড়ে, বাবা বা মায়ের বাড়ি ছেড়ে অলবানি স্ট্রীটের এই বাড়ির তেতলায় এসে জায়গা নিয়েছে আজ বেশ কয়েক মাস। নিচের দুটি তলাতেও এ ধরনের। কিছু দল আছে। আসলে, আগে থেকে যারা পরিচিত, তারা এখানে এসেও সূত্রটা রক্ষা করে বলে ছোট ছোট দলে তারা ভাগ করা মনে হয়। সবাই আবার এক

সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন বসে বাড়ির ভালোমন্দ, পানি বিজলী নিয়ে আলোচনা করে। পুলিশি উৎখাত উৎপাতের মোকাবেলা করা যায় কী করে, আলাপ করে।

মায়ের কাছে বন্ধুর জন্মদিনের কথা মিথ্যে বলে ইয়াসমিন সোজা চলে আসে অলবানি স্ট্রীটের তেতলায়। তাকে দেখে হৈচৈ করে ওঠে পিটার, ভিনসেন্ট, জো, গ্যাবি, কোকো, প্যাম, এমনকি স্বভাবতই যে চুপচাপ থাকে, রাতে গোরস্তানে গিয়ে গিটার বাজায়, সেই মার্ক পর্যন্ত খুশি হয়। এরা সকলেই এক ইস্কুলে পড়াশোনা করত। এদের দলে এতদিন নাম লেখায় নি কেবল ইয়াসমিন।

সন্ধে বেলায় এসে প্রথমে সে বলে নি, বাড়িতে আর ফিরবে না বলেই সে এসেছে। সমস্ত সন্ধে-রাত, দুপুর-রাত পর্যন্ত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যাবার পর, গ্যাবি আর ভিনসেন্ট, কোকো আর পিটার, প্যাম আর জো, একে অপরের কাঁধে মাথা রেখে জুটি বেঁধে যাবার পর ইয়াসমিন ভীষণ একা বোধ করতে থাকে। তার একবার মনে হয়, বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু এদের মুক্ত এই জীবন তাকে আয়নার মতো আকর্ষণ করে রাখে। দূরে, একা, আপনমনে গিটার বাজাচ্ছিল মার্ক। সে ধীরে এগিয়ে আসে ইয়াসমিনের কাছে এবং একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করে বন্ধুদের সান্নিধ্যে নিঃসঙ্গ বোধ করিও না। তারপর আর কিছু না বলে গিটার নিয়ে কিছুক্ষণ টুংটাং করে খসখসে গলায় গান ধরে মার্ক। কথাগুলো ইয়াসমিনকে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

অদ্যই আগামীকাল, আগামীকালই অদ্য। জনুই মৃত্যু এবং মৃত্যুই জীবন। সম্পদই দারিদ্র্য দারিদ্রাই সম্পদ। বন্ধু উপলব্ধি করিলেই তুমি আমার বন্ধু। তোমারও স্থান আছে হেঁড়াকোটের তলায়।

মানুষের চোখে চোখ— ইন্দ্রজাল। জলের গভীরে মাছ ইজাল। শব্দের অতলে নীরবতা— ইন্দ্রজাল। বন্ধু, কোলাহল থামলেই তুমি আমার বন্ধু। তোমারও স্থান আছে হৃদয়ের আগুনের পাশে।

সারারাত ঘুমের ভেতরেও গানটি শুনতে পায় ইয়াসমিন। সকালে জেগে উঠে নিজেকে যখন সে আবিষ্কার করে তারা সকলে মেঝের ওপর গোল হয়ে ঘুমিয়ে আছে তখন সে আপন মনেই বলে ওঠে, ইহা সুন্দর, ইহা কী সুন্দর!

তারপর ঘুম থেকে উঠে সবাই গোল হয়ে যোগাসন করতে বসে। ইয়াসমিনের অভ্যেস নেই, তবু সেও তাদের অনুকরণ করে। ভিনসেন্টের নেতৃত্বে আধঘণ্টা ধ্যান শেষ হবার পর ইয়াসমিন সোজা উঠে গিয়ে তাকে বলে, এই আমার বাসগৃহ। আমাকে তোমরা গ্রহণ করিবে?

ভিনসেন্ট ঘোষণা করে, হাততালি থেমে যাবার পর, অতঃপর ইয়াসমিন জন্মগ্রহণ করিবে। আমরা সেই স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিব।

এই দলটির প্রধান হিসেবে ভিনসেন্টকে সকলেই মান্য করে। বয়সেও সে সকলের চেয়ে বড়। তার বাবার অবস্থাও অত্যন্ত ভালো। বাবা বিলেতের সবচেয়ে নামকরা স্থপতি। ভিনসেন্টের মতে, তিনি মানুষের জন্যে কারাগার নির্মাণ করেন। উন্মুক্ত আকাশ নির্মাণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

ভিনসেন্ট এখন অনুষ্ঠানটির নেতৃত্ব দেয়। দলনেতা হিসাবে সে তার জুটি গ্যাবিকেই জননী হিসাবে মনোনয়ন করে।

ভিনসেন্ট ঘোষণা করে, তোমরা দেয়াল ঘেঁষিয়া চক্রাকারে উপবেশন কর। পদ্মাসনে তন্তয় হও। অতঃপর, গ্যাবি, এই রমণী, বিশ্বজননী হইল। ইয়াসমিন, নিকটে আইস। তুমি কি এই রমণীকে চিনিতে পার?

ইয়াসমিন ঠিক বুঝতে পারে না, কী তার উত্তর হওয়া দরকার। সে নিজেকে তুচ্ছ ও অসহায় বোধ করতে থাকে।

ভালো করিয়া অবলোকন কর। অনুমান হয়?

গ্যাবি গোল চক্রের মাঝখানে ধ্যাননেত্রে বসে আছে। তার কাঁধের দু পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে সোনালি দীর্ঘচুল। মুখখানি একই সঙ্গে কোমল ও কঠিন বলে মনে হচ্ছে। ইয়াসমিন হঠাৎ যেন এতদিনের চেনা গ্যাবিকে চিনে উঠতে পারে না। মুহূর্ত কালের

জন্যে তার ভয় হয়। সে পাশে তাকাতেই মার্ক হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এসে তার কানে কানে বলে, বল, হাঁ, চিনিতে পারিতেছি। ইনিই আমার গর্ভধারিণী।

হাঁ, চিনিতে পারিতেছি, ইনিই আমার গর্ভধারিণী।

সন্দেহ নাই?

ইয়াসমিন অনুষ্ঠানের মাদকতায় প্রতিধ্বনি করে ওঠে, সন্দেহ নাই।

ভিনসেন্ট চোখ বুজে গম গম গলায় উচ্চারণ করে, তবে গর্ভে প্রবিষ্ট হও।

ইয়াসমিন আবার অপ্রতিভ বোধ করে। কী কর্তব্য অনুমান করতে পারে না। এদের উপযুক্ত সে এখনো নয়, তাকে ক্লিষ্ট করে ফেলে।

ভিনসেন্ট নিমিলীত চোখেই বলে, ক্ষণকাল অপেক্ষা করবার পর, বালিকাগণ, তোমাদের কি কর্তব্যবোধ নাই? তোমাদের ভগ্নীকে সাহায্য করিবার কোনো প্রেরণাই কি বোধ করিতেছ না?

চঞ্চল হয়ে ওঠে প্যাম, কোকো। তারা জো আর পিটারের পাশ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে ইয়াসমিনের কাছে। ইঙ্গিতে তাকে উঠে দাঁড়াতে বলে। বসে থাকা প্রত্যেকের দিকে চোখ না ফিরিয়েও ইয়াসমিনের মনে হয়, সে ভীষণ লম্বা হয়ে গেছে।

তার সংকোচ বোধ হয়। কিছুক্ষণ পর অতি ধীর গতিতে উঠে দাঁড়ায় কোকো আর প্যাম। নিঃশব্দে তারা ইয়াসমিনের দেহ থেকে একে একে সোয়েটার, জামা, লম্বা স্কার্ট স্নেহের সঙ্গে খুলে ফেলতে থাকে। ইস্কুলে সাঁতার কেটেছে, যদিও বাবা জানলে তাকে সাঁতার কাটতে দিতেন না ঐ সংক্ষিপ্ত পোশাকে, এ ছাড়া প্রকাশ্যে অনাবৃত হবার অভিজ্ঞতা তার নেই। মুহূর্তের জন্য একবার মনে হলো, তার ভীষণ লজ্জা করবে। কিন্তু একে একে যখন সমস্ত কিছু পায়ের। কাছে লুটিয়ে পড়ল, তখন বিন্দুমাত্র মনে হলো না, সে উলঙ্গ। নগ্নতার উপলব্ধি যদি কিছুটা হয়ে থাকে তো শীতবোধেই তা সীমিত। তার নিজের মনে হয়, লজ্জায় নয় শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দুহাত বুকের ওপর গুটিয়ে আনে এবং দু হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে দেয়।

সে কাঁধ গুটিয়ে বসে পড়তে গিয়েও, পাছে কিছু ত্রুটি হয়, বসে না।

ভিনসেন্ট নির্দেশ উচ্চারণ করে, প্রবিষ্ট হও।

তার সেই কণ্ঠস্বরের অভিঘাতেই যেন ইয়াসমিন উপুড় হয়ে বসে পড়ে। তার মাথার ভেতরে ঝিম ঝিম করতে থাকে। ভোরে উঠেই এক প্রস্থ ধোঁয়া গেলার পর যা মনে হয় নি, এখন নিজেকে অস্বভাবিক রকমে নির্ভার ও অবাস্তব বলে বোধহয় তার।

ইয়াসমিন কাত হয়ে শুয়ে পড়ে। শিশুর মতো তার পা ভাঁজ হয়ে আসে বুকের কাছে, তার ফাঁকে দুহাত গুঁজে দেয় সে। ঠোঁট নীল হয়ে যায় শীতে ও উত্তেজনায়। ঠোঁট থর থর করে কাঁপতে থাকে।

ইয়াসমিন প্রবিষ্ট হও।

ইয়াসমিন তার দুপাশে কিছু একটার উপস্থিতি অনুভব করে। চোখ খুলে দ্যাখে গ্যাবি যে এতক্ষণ পদ্মাসনে বসেছিল, এখন সে দুপা ছড়িয়ে ইয়াসমিনের দুদিকে মেলে দিয়েছে। তখন তার পাশ থেকে সরে গেছে প্যাম আর কোকো। তারা ফিরে গেছে জো আর পিটারের কাছে। যার যার জুটির হাত শক্ত মুঠোয় ধরে তারা বিস্ফারিত চোখে স্থির তাকিয়ে আছে ইয়াসমিনের দিকে।

ধীরে ধীরে গ্যাবি এগোয়। বসে বসেই সে এগিয়ে এসে দুপায়ের ভেতরে ইয়াসমিনের মাথাটা সম্পূর্ণ নিয়ে নেয়। তারপর নিজের লম্বা স্কার্ট দিয়ে ঢেকে দেয় তার মাথা, কাঁধ, পিঠ। ক্রমশ ইয়াসমিনের পুরো দেহে ঢাকা পড়ে যায় গ্যাবির ঢিলে স্কার্টের তলায়।

মার্ক তার গিটারে ঝনঝনাৎ করে অপ্রত্যাশিত এবং ক্ষণস্থায়ী আওয়াজ তোলে।

ইয়াসমিন, তুমি এখন কোথায়?

এইখানে।

বিশ্বজননীর গর্ভে?

সকলে একসঙ্গে মন্ত্রের মতো প্রতিধ্বনি করে, বল, হাঁ, বিশ্বজননীর গর্ভে।

হাঁ, বিশ্বজননীর গর্ভে।

তুমি কি গর্ভের উষ্ণতা বোধ করিতেছ?

এবার সমবেত সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইয়াসমিন বলে–হাঁ, গর্ভের উষ্ণতা বোধ করিতেছি।

তোমার কি ভ্রূণাবস্থা?

হাঁ, আমার ভ্রূণাবস্থা।

তোমার কি হস্তপদ আছে?

না, আমার হস্তপদ নাই।

তোমার কি চক্ষু আছে?

না, আমার চক্ষুও নাই।

ভিনসেন্ট এবার আদেশ করে, তুমি প্রার্থনা কর–আমাকে ভ্রূণ হইতে পূর্ণদেহ কর যাহাতে দেহের সমস্ত সম্ভাবনা আবিষ্কার করিতে পারি, আমাকে হস্তপদ প্রদান কর যাহাতে নির্মাণ ও অতিক্রম করিতে পারি, আমাকে চক্ষু দাও যাহাতে বন্ধুকে অবলোকন করিতে পারি। তুমি ভূমিষ্ঠ হও।

সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসমিন টের পায় গ্যাবির পা দুখানা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। প্রথমে সে গুরুত্ব দেয় নি, ক্ষণকাল পরে কণ্ঠনালীর ওপর পায়ের সবল চাপ অনুভব করে সে। গ্যাবির স্কার্টের ভেতর তার সমস্তটা শরীর, ফলে নিঃশ্বাস নেয়া আরো কঠিন হয়ে পড়ে। সে ছটফট করতে থাকে। আর্তনাদ করে ওঠে। গ্যাবি আরো জোরে পীড়ন করতে থাকে তাকে। সে তখন নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে, গ্যাবির স্কার্টের তলা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

মুহূর্তেই সে বেরিয়ে আসে গ্যাবির স্কার্টের ভেতর থেকে। বেরিয়ে মেঝের উপর নগ্নদেহে পড়ে থেকে সে হাঁপায়। সকলে একসঙ্গে আহ ধ্বনি করে ওঠে। প্যাম একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয় ইয়াসমিনকে।

ভিনসেন্ট ঘোষণা করে— বালিকার জন্ম হইয়াছে। সে এখন শায়িত আছে। ক্ষণকাল পরে সে যৌবনপ্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের আনন্দে অংশগ্রহণ করিবে।

ইয়াসমিন উপলব্ধি করে, মায়ের পেট থেকে বেরুবার অভিনয় সে এইবার করে উঠল।

গ্যাবি পা দিয়ে চেপে ধরায় অভিনয় যে জীবন্ত হয়, এতে সে আমোদ বোধ করে এখন। বন্ধুদের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা বোধ করে।

ভিনসেন্ট বলে, আজ আমরা দিবস ও রজনী আনন্দ করিব। ইয়াসমিন, উঠ, বস্ত্র পরিধান কর। তুমি এখন যথার্থই আমাদের হইলে।

ইয়াসমিন উঠে বসে প্যামের দিকে হাত বাড়ায়— আমার শার্ট কোথায় রাখিয়াছ?

উহা এখন পরিতে পারিবে না। ভিন্ন পোশাক পরিতে হইবে।

আমি যে দ্বিতীয় বস্ত্র সঙ্গে আনি নাই। মাহজাবীনকে বলিয়া আসিয়াছি, সে যদি পারে আমার কিছু কাপড় ও জিনিস দিয়া যাইবে।

তবে এখনকার মতো আমার জীনস পরিয়া লও।

ইয়াসমিন কম্বল গায়ে উঠে দাঁড়ায়। পাশের ঘরে গিয়ে প্যামের হাত থেকে জীনস নেয়।

প্যাম বলে, তোমার জন্মগ্রহণ সুন্দর হইয়াছে।

অদ্ভুত মনে হইলেও অনুষ্ঠানটির সৌন্দর্য আছে।

ইহা ভিনসেন্টের উদ্ভাবনা। সে বলে, আচার অনুষ্ঠান ভিন্ন দলীয় সংহতি নাই, আত্মার বন্ধনও স্থাপিত হয় না।

আমার তো এখন মজাই লাগিতেছে। বাড়ি হইতে পালাইয়া বাচিয়াছি। নইলে আজই হয়তো আমার বিবাহ দিয়া দিত।

জীনস পরে ইয়াসমিন বলে, নগ্নবক্ষ হইয়া থাকিব নাকি? জামা দিবে না?

নগ্নই তো সুন্দর। তোমার বক্ষের গড়ন অপূর্ব। বলতে বলতে প্যাম একটা লেবু-হলুদ শার্ট ধার দেয়।

ভারি সুন্দর শার্ট। কোথা হইতে কিনিয়াছ?

পোর্টোবেলো মার্কেট হইতে চুরি করিয়াছি।

মাহজাবীন আমার পোশাকগুলি আনিতে পারিবে কিনা, কে জানে।

ইয়াসমিন যখন পাশের ঘরে ফিরে যায়, তাকে দেখেই পিটার শিস দিয়ে ওঠে। তার বান্ধবী কোকো সঙ্গে সঙ্গে আদরের কোমল চড় লাগিয়ে দেয় পিটারকে। শাসন করে– ভিন্ন ক্ষেতে ফসল বপন করিবে না।

পিটার চটপট উত্তর দেয়, শিস ক্ষেত দেখিয়া দিই নাই, ক্ষেতের গায়ে টাঙ্গানো নোটিশ দেখিয়া দিয়াছি।

পিটার আঙ্গুল দিয়ে ইয়াসমিনের পেছনটা দেখিয়ে দেয়। সেখানে, জীনসের ওপর সাটা স্টিকার। তাতে লেখা I'M A LUNATIK.

ভিনসেন্ট ইয়াসমিনকে কাছে ডাকে। তোমার সঙ্গে অর্থ কী পরিমাণ আছে?

গুনিয়া দেখি নাই। সামান্য আছে।

বৃদ্ধের কিঞ্চিত খসাইয়া আসা উচিত ছিল। উহারা পুঁজিবাদী। যে ভবিষ্যত আনবিক বোমার আতঙ্কে দ্বিখণ্ডিত, উহারা সেই ভবিষ্যতের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে। অথচ কুসুমের সন্তানেরা ধ্যানের খোরাক পায় না। উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হয়। ধরা পড়িলে কারাদণ্ড, তাও দীর্ঘমেয়াদী।

পাউণ্ড দশেকের মতো ছিল, ইয়াসমিন ভিনসেন্টের হাতে তুলে দেয়।

মাহজাবীন আসিলে বলিব, আমাকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবে।

ভিনসেন্ট উপদেশ করে, সরকারি আপিসে গিয়া বেকারভাতার জন্য নাম লিখাইয়া আসিবে। তুচ্ছ এই বাস্তব লইয়া কথা বলিতে আমার ভালো লাগে না। পিটার সিগারেট বানাইতেছে। তুমি আমার নিকটে থাক। আনন্দে তোমাকে দীক্ষা লইতে হইবে না?

গাঁজার অভ্যাস আমার আছে। পিটার জানে। গ্যাবি জানে। আজ প্রভাতেও গোটা তিনেক টান দিয়াছি।

ইয়াসমিনের বাহাদুরি নস্যাৎ করে দেয় ভিনসেন্ট। বলে, টানিলেই টানা হয় না। টানিবার মতো টানিতে হয়। নিজেকে প্রস্তুত করিতে হয়। তোমাকে দেখাইয়া দিলে বুঝিবে, পূর্বের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতাই নহে।

ইয়াসমিন হঠাৎ লক্ষ করে মার্ক গিটারে টুংটাং করতে করতে তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

কী মার্ক?

মার্ক আপন মনে টুং টাং করে চলে। উত্তর দেয় না। দৃষ্টিও ফিরিয়ে নেয় না। তখন ইয়াসমিন তার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, ড্যাবড্যাব করিয়া কী দেখিতেছ? তোমাকে তো ভালো মানুষ বলিয়াই জানিতাম।

মার্ক টুংটাং করতে করতেই প্রশ্ন করে, ইয়াসমিন, তুমি কি কাহারো সহিত নিদ্রা গিয়াছ?

না।

আমারও তাই বোধ হইতেছিল।

যখন আমার দেহ নগ্ন ছিল, তুমি বুঝি এই দেখিতেছিলে?

হাঁ, সত্য বলিলাম।

দেখিলে, তো বুঝিলে কী করিয়া আমি কুমারী? এত অভিজ্ঞতা কাহার কৃপায় লাভ করিয়াছ, মার্ক। বল, আমাকে সত্য করিয়া বল। আমার কাছে লুকাইবে না। আমি সব শুনিতে চাই। তুমি আমার সহিত নিদ্রা যাইবে?

ইয়াসমিন একটু চিন্তা করে বলে, প্রস্তাব করিতেছ, না ঠাট্টা করিতেছ? যদি ঠাট্টা হয়, তোমার মুখে জলত্যাগ করিব।

আর যদি প্রস্তাব হয়?

ভাবিয়া দেখিব, তোমার মতো অভিজ্ঞলোকের কাছে কুমারীত্ব বিসর্জন দিব, না কোনো অনিপুনকে বাছিয়া লইব। মার্ক ঠাট্টা রাখ। তুমি কি সত্যই এইসব ভাবিতেছিলে?

তুমি হয়তো জান না ইয়াসমিন, নারীর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নাই। যদি চাহিতাম, গ্যাবির সহিত, কোকোর সহিত, প্যামের সহিত, এমনকি তোমার সহিত নিদ্রা দিতে পারিতাম। নিচের তলায় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও, তিন বালিকা আমার সহিত সম্পর্ক করিতে খেপিয়া রহিয়াছে।

তবু, মুখ খারাপ করিলে কেন?

আমি যখন গান রচনা করি, ইয়াসমিন, তখন আমার চেতনার অভ্যন্তরে দুই শক্তি ক্রিয়া করে। এক, কাব্যশক্তি, দুই, দেহশক্তি। উভয়ই মূলত প্রজনন। রচনাকালে আমি নারী সঙ্গ কল্পনা না করিয়া পারি না। কখনো কখনো আমার স্খলনও হয়।

এখন?

এখনও পরাজিত নহি? তোমার জন্য এই মাত্র একটি গান রচনা করিতেছিলাম। যদি শুনিতে চাও, গাহিতে পারি।

আমি শুনিব। আমাকে লইয়া পূর্বে কেহ গান রচনা করে নাই।

ভিনসেন্ট এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল পিটারের সঙ্গে বসে সিগারেট বানানোয়। ইয়াসমিনকে মার্কের সঙ্গে, যে মার্ক স্বভাবতই কম কথা বলে, কথা বলতে দেখে সে দূর থেকেই হলা দেয়।

ইয়াসমিন সাবধানে থাকিও, কোনো কোনো জন্তুর বাকশক্তি নাই, কামড় দিতে দড়।

মার্ক সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে গান ধরে, মৃদু গলায়, ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার বাসায়। আসিও না। ভুলিবার জন্য কেহ ভালোবাসিও না। ইহার চেয়ে শূন্যতা অনেক ভালো। ইহার চেয়ে শূন্য চোখে দূরের কোনো জামার দিকে দৃষ্টি করা অনেক ভালো। ও ইয়াসমিন, আসিও না, ভালো বাসিও না।

ভিনসেন্ট উঠে আসে ইয়াসমিনের কাছে। বলে, সিগারেট প্রস্তুত, দীক্ষা লইবে না?

৭. রাগের মাথায় বললেও

রাগের মাথায় বললেও, কথাটা ঠিকই বলেছিল নাহার। মাহজাবীন আসলে ইয়াসমিনের চেয়েও ধুরন্ধর। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, ভেতরে ভেতরে কী হচ্ছে। এমন চমৎকার তার অভিনয় যে মিস্টার আলির মতো দশ ঘাটের পানি খাওয়া লোক মাহজাবীনের সম্পর্কে একেবারে উলটো ধারণা নিয়ে বসে আছেন।

ইয়াসমিন যে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে মাহজাবীন তা গতকালই জানত। দুবোনে এ নিয়ে লম্বা পরামর্শও হয়েছে।

আমি কি গোবৎস, বীন, যে একজন কৃষক আমাকে কিনিবার জন্য দেখিতে আসিতেছে? কাল তোমার বিবাহ দিবে, পরশু আমাকেও কাহারো হাতে তুলিয়া দিবে।

এই পিতামাতার হাতে পড়িয়া জীবন একশেষ হইল। হাত খরচের অর্থ পাই না চুরি করিতে হয়, বাহিরে গেলে তিরস্কার শুনিতে হয়, ফোন ব্যবহার করিলে পিতা সর্বস্বান্ত হইবার অভিনয় করেন।

আবার মায়ের বাঙালি বান্ধবীরা আমাদের চলন লইয়া যখন উদ্বেগ প্রকাশ করেন, কেন আমরা গা ঢাকিয়া পোশাক পরি না অনুযোগ করেন, কেন আমরা বাংলা বলিতে পারি না বলিয়া খুঁত ধরেন, তখন মা একেবারে আমাদের লইয়া পড়েন।

উহারা কেবল কারি রাধিতে জানে, জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই।

আমাদের আর-আর বন্ধুরা কী সুখে আছে!

তাই আমি চলিলাম। সাবধান, প্রকাশ না পায়।

পাইবে না।

প্রকাশ হইলে তোমারই মন্দ। তোমাকে আর বাহির হইতে সাহায্য করিতে পারিব না, বীন। ভান করিবে যেন তুমি কিছুই জান না।

তোমাকে আর শিখাইয়া দিতে হইবে না। আমার বয়স যদি মোল হইত, আমিও বাড়ি ছাড়িয়া দিতাম। তোমার মতো স্বাধীন হইতাম।

সেদিন দেখিয়াছি, মালেকা, তোমার বয়সী, দিব্যি বাড়িতে সিগারেট খাইতেছে। তাহার মা কিছুই মনে করে নাই। আমরা বিয়ার লেমনেড দিয়া খাই, তাহার পরে কড়া ঝাঁঝের চুয়িংগাম খাই, তবু আশঙ্কা হয় মা ধরিয়া ফেলিবেন। কেন, আমার কি বয়স হয় নাই? আমি কি আপনার ভালোমন্দ বুঝি না।

খাঁটি কথা বলিয়াছ। তবে, আমাকে তো চুপ করিয়া সহ্য করিতেই হয়। পনের চলিতেছে। আর এক বছর পরে কাহারো তোয়াক্কা করিব না। অ্যালিসনের মতো আমিও

সিনেমায় যাইব, জিনজার এল দিয়া হুইস্কি পান করিব, নাচিব, গাহিব, পায়ে হাঁটিয়া বিশ্বভ্রমণ করিব। তুমি ভাগ্যবতী, সতের বৎসর হইয়াছে, তুমি চলিলে, আমি পড়িয়া রহিলাম।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মা কাছে কাছেই ছিলেন বলে ইয়াসমিন নিজের কিছু কাপড় আর দরকারি জিনিস দুটো ব্যাগে গুছিয়ে রেখেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। ব্যাগ দেখলেই প্রশ্ন হতো, এমনকি যেমন মা, তল্লাশীও হয়ে যেতে পারত। অবশ্য, একবার বেরিয়ে যাবার পর ফিরে এসে ব্যাগ এবং নিজের সব কিছু নিয়ে যেতে বাধা নেই। মোল বছর বয়স কবেই পার হয়ে গেছে, এখন পুলিশও তাকে বাড়ি ফিরতে বাধ্য করতে পারবে না, এমনকি এখন সে সোজা ডাক্তারের কাছে গিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি চাইতে পারে, মা-বাবার অনুমতি লাগবে না। তবু বাড়ি ছেড়ে পরদিনই বাড়িতে ব্যাগ নিতে আসাটা সহজ নয়। মা-বাবা কান্নাকাটি করতে পারে, এবং হাজার হোক তারা মা-বাবা, যত সেকেলেই হোক তারা একেবারে বুকের ওপর দাঁড়িয়ে গলায় পা দেয়া যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত মাহজাবীনকে বলে যেতে হয়, সে যেন যে করেই হোক অলবানি স্ট্রীটে ব্যাগ দুটো না হোক অন্তত একটা আজ পৌঁছে দেয়।

দুটো নেয়া মুশকিল হবে। মাহজাবীন বোনের ঘরে ঢুকে, খাটের তলা থেকে ব্যাগ দুটো বের করে দ্রুত হাতে বিশেষ জরুরি জিনিস বেছে নেয়। নিয়ে, একটাতে ভরে ফেলে। তারপর, নিজের ঘরে গিয়ে পড়ার লাইব্রেরি থেকে গত সপ্তাহে ধার করে আনা দুখানা বই সেই ব্যাগের ওপরে সাজিয়ে রাখে।

ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দ্যাখে, মা কোথায়।

নাহার তখন আপিস ঘরেই। মিস্টার আলি বাইরে থেকে ফেরেন নি।

নিঃশব্দে দরোজা খুলে ঢোকে মাহজাবীন। ইতস্তত করে বলে, মাম, নাসরিন ক্ষুধার্ত।

চৈতন্য হয় নাহারের। সকালবেলায় এত বড় একটা ধাক্কায় ছোট মেয়েটির খাওয়ার কথা একবারেই ভুলে গিয়েছিল। উদ্বেগ আর অপরাধবোধ মিশে গিয়ে তাকে ঝাঝালো করে তোলে।

কেন, তুমি কিছু করে দিতে পার নি? দেখছ না আমি আপিসে আছি?

তুমি অহেতুক বকিতেছ। আমি খোঁজ নিতে আসিযাছি, তুমি কিছু খাইবে কি না। নাসরিন এবং আমার বিফবার্গার করিতেছি। তুমি খাইবে তো তোমাকেও করিয়া দিই।

মেয়েটির কথায় হঠাৎ কোমল হয়ে যায় নাহারের মন। আহা, পেটের মেয়ে তো, বড়টির মতো নিষ্ঠুর নয়, মায়ের মন খারাপ দেখে কোনোদিন যা করে না, আজ খাবার তৈরি করে। দিতে চাইছে।

নাহার মেয়ের হাত ধরে কাছে টানে।

কাছে আয়।

মাহজাবীন ভেতরে ভেতরে খুশি হয়। মাকে রাজি করানো তাহলে শক্ত হবে না। চাইকি ঘণ্টা তিনেকের ছুটিও পাওয়া যেতে পারে। তাহলে সোজা অলবানি স্ট্রীট।

নাহার মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, মিনার মনে কি দয়ামায়া নেইরে? বাবা-মা, ছোট ছোট দুটো বোন, কারো জন্য মন কাঁদল না?

মাহজাবীন নাহারের গালে ছোট্ট করে চুমো দিয়ে বলে, আর ভাবিও না, মাম। এখন কিছু আহার কর। আমি আনিয়া দিতেছি।

পাখির মতো উড়ে যায় মাহজাবীন। নাহারের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দুটো মেয়ে দু রকম হলো কেন?

ছোটটিই বা কেমন হবে, কে জানে? আল্লাকে স্মরণ করে নাহার। দেশের বাড়ির জন্য মন হঠাৎ আকূল হয়ে ওঠে। এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল ঢাকায় থাকা।

.

ও মা, এর মধ্যে সব করে ফেলেছিস? আমার যে খিদে নেই মা। মিনার জন্যে কিছু ভালো লাগছে না।

তোমার ভালো লাগিবে এবং তুমি আহার করিবে। নহিলে বুঝিব, তুমি আমাদের ভালোবাস না, বুবুকেই ভালোবাস।

অগত্যা খাবার তুলতেই হয় নাহারকে। নাসরিনকে কোলে নিয়ে খেতে থাকে সে।

মাম। মাহজাবীন সাহস করে ডাক দেয়।

কীরে?

আজ শনিবার। পাঠাগারে বই ফিরাইয়া দিবার দিন।

নাহারের একটু খটকা লাগে। এর আগেও গত শনিবার মাহজীবন বই ফেরাতে গেছে, তার জন্যে ঘটা করে অনুমতি নেয় নি। বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বলেছে, লাইব্রেরিতে যাচ্ছি।

মায়ের মুখে সহসা মেঘ লক্ষ করে মাহজাবীন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তোমাকে একা ফেলিয়া যাইতে চাহি না। অথচ, আজ বই না ফিরাইলে জরিমানা দিতে হইবে।

নাহারের মন থেকে মেঘ কেটে যায়। ইয়াসমিন অমন একটা কাণ্ড করেছে বলেই মেজ মেয়ে মায়ের কথা এত বেশি করে ভাবছে। মাহজাবীনের দিকে তার সমস্ত স্নেহ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বেশ তো, যা। দেরি করিস না। বাড়িতে মেহমান আসবে।

হাঁ, মাম, তাহাকে কী বলিবে?

জানি না, কী বলব। সে রওয়ানা হয়ে গেছে, ফোন করে মানা করবারও জো নেই।

আমি না হয় একটা মিথ্যা বলিয়া দিব। তাহাকে গল্পে মাতাইয়া রাখিব। সে কেমন হয়, মাম?

নাহার প্রীত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে— বুড়ির মতো কথা তোর!

মাম, পাঠাগারের নিকটেই চন্দনা পৌলদের বাড়ি। ফিরবার পথে চন্দনাকে দেখিয়া আসিব?

উদ্বিগ্ন চোখে মাহজাবীন মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনুমতি আদায়ের চেয়েও এই মুহূর্তে তার বড় ভাবনা, মা মিথ্যেটুকু ধরতে পারল কি?

তাহলে নাসরিনকেও নিয়ে যা।

নাসরিন এখনো পড়ছে। সকালের চার্লি ব্রাউন শেষ হয়ে, আরেকটা শেষ হয়ে, তিন নম্বর চার্লি ব্রাউনের বই তার হাতে এখন। নীরবে পড়ে যাচ্ছে আর খাচ্ছে। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

বাঁচিয়ে দিল নাসরিনই।

চন্দনাকে আমি পছন্দ করি না। তাহার মাথায় উকুন আছে।

মাহজাবীন ভাংচি কাটে।

উকুন তোমার মাথায়, ক্ষুদে শয়তান।

আমার মাথায় উকুন তোমার মাথা হইতে আসিয়াছে।

নাহার বাধা দেয়।

এই শুরু হলো দুজনের। চুপ কর। আমার মন ভালো নেই।

নাসরিন সহজে ছাড়ে না। মাকে সে মনে করিয়ে দেয়, বুবুর যে ঘর খালি হইয়াছে, আমাকে সেখানে দখল দিবে তো? আমি এই মুখরা বালিকার সহিত এক ঘরে বাস করিব না।

নাহার ধমক দেয়, আহ, রিনা। বুবুকে এভাবে তে নেই।

আমি বলিব।

না, বলবে না।

ঠাস করে পিঠে কিল বসিয়ে দেয় নাহার।

বেয়াদব মেয়ে। বীনা, তুই যাবি তো যা। আমাকে আর তোরা জ্বালাসনে। আমার চোখের সমুখ থেকে দূর হয়ে যা।

মাহজাবীন নাহারের চোখের আড়ালে নাসরিনকে ছোট্ট করে ভাংচি কেটে দ্রুত বেরিয়ে যায়। ওপরে গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে তরতর করে নামে। এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। পাছে, মায়ের মত বদলে যায়। যাবার সময় হল থেকে চিৎকার করে বলে যায়, বিদায়, মাম।

টেলিফোন বেজে ওঠে, মাহজাবীনকে তাড়াতাড়ি ফেরার কথা বলবার আগেই।

নাহার ফোন তুলে নেয়।

শাপলা ট্রাভেল এজেন্সি। হ্যালো।

করিম বলিতেছি।

আপনার টিকিট তো?

হাঁ, প্রস্তুত আছে কি? কখন আসিব? আপনি কি বাংলা বলেন।

হাঁ, আমি মিসেস আলি। উনি একটু পরেই ফিরবেন। আপনি তিনটের দিকে আসুন।

আচ্ছা। আচ্ছা, কবেকার ফ্লাইট বলতে পারবেন, মিসেস আলি?

উনি বলতে পারবেন।

জানতে পারলে ভালো হতো। টেলিগ্রাম করে দিতে পারতাম। বাংলাদেশের ব্যাপার কদ্দিনে পৌঁছায়। আমার আবার আর্জেন্ট ব্যাপার। আচ্ছা, তিনটের সময় আসব।

ফোন রেখে দিতে না দিতেই কাচের ভেতর দিয়ে স্বামীকে দেখতে পায় নাহার। ক্লান্ত পায়ে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসছে। রাস্তার ওপারে ক্রসিংয়ে এসে দাঁড়ান আলি। সিগন্যাল

দেখে দ্রুত পায়ে পথ পেরিয়ে আবার ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন। হাতের ব্রিফকেসটাও যেন আজ বড় ভারি মনে হচ্ছে। একদিকে একটু ঝুঁকে পড়েছেন।

আলি দরোজা ঠেলে ঢুকতেই নাহার উঠে দাঁড়াল। নাহারের চোখে মুখে ফিরে এলো উদ্বেগ, সকালবেলার সমান মাত্রায়।

টেবিলের ওপর ব্রিফকেসটা নামিয়ে রেখে আলি বলেন, থানায় গিয়েছিলাম। বলে চুপ করে বসে থাকেন। অনেকক্ষণ আর কিছু বলেন না।

কেন, থানায় কেন? কী হয়েছে ইয়াসমিনের?

নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না নাহার। এই সম্ভাবনাটা তার মাথায় আসে নি কেন? মেয়েটি বাড়ি না পালিয়ে আসলে কোনো বিপদেও পড়তে পারে তো? অপহরণ? ধর্ষণ? খুন?

চুপ করে থেকো না, আমাকে বল কী হয়েছে।

না, কিছু হয় নি।

তাহলে থানায় গেলে কেন?

জানিয়ে রাখলাম ওদের। যেখানেই আছে, বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। নইলে কোনো দুর্ঘটনার কথা দুজনের কারোরই মনে এলো না কেন? ট্রেনে খবরের কাগজে, কারা ষোল বছরের একটা ইংরেজ মেয়েকে রেপ করে মেরে গেছে, সেই খবর দেখে, মনটা কেমন করে উঠল। গেলাম থানায়। মেয়ের বয়স আইনের চোখে সাবালিকা। স্বেচ্ছায় গেলে তো আর পুলিশ ফিরিয়ে আনতে পারে না। কিন্তু ওদের ব্যবহারটা দেখে অবাক হলাম। আমার গায়ের রঙ দেখে কিনা জানি না, প্রথমে অনেকক্ষণ পাত্তাই দিল না, দাঁড়িয়ে থাকতে হলো, অথচ লন্ডনের পুলিশের কত নাম কত গল্প শুনেছি, নিজেও দেখেছি, আগে এ রকম ছিল না, এখন যেন অন্য রকম, আমার কাছে সব শুনে, তেমন কোনো মেয়ের কিছু হয়েছে বলে তাদের জানা নেই এই কথাটা এমনভাবে বলল, যেন আমি মেয়ের বাবা নই, অন্য কেউ, বাইরের কেউ খামোখা বিরক্ত করতে গেছি। তারপর নাহার, পুলিশ একগাদা আমাকে উপদেশও দিল।

আলি আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন যেন মনে মনে আবার থানায় ফিরে যান।

কী বলল তারা?

সে আর তুমি শুনে কী করবে? স্ত্রীর দিকে করুণ চোখ তুলে আলি তাকান। আজকাল লন্ডনে বহু ভারতীয় মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করছে। ঐ যে প্লে-বয় বলে একটা খারাপ কাগজ আছে, ওতে নাকি ভারতীয় কোনো এক মেয়ে, কোথায় কোন ব্যাংকে কাজ করে, তার সব বিবস্ত্র ছবি বেরিয়েছে। সেই থেকে ভারতীয় মেয়েদের নাকি খুব চাহিদা। মানে বুঝতেই পারছ, পুলিশ বলতে চাইল, সে রকম কোনো হাবভাব মেয়ের মধ্যে লক্ষ

করেছি কি না। কী আর বলব কাকে? নিজের মেয়েকে নিয়ে এ সব কথা শোনাও, কী বলে, মরণতুল্য। নাহ, আমাদের জন্য পুলিশেরও আর কোনো সহানুভূতি নেই দেখলেই তো, দু দুবার আমার এই আপিসের কাচ দুধের বোতল মেরে শাদা ছোকরাগুলো ভাঙল, করল কিছু পুলিশ? এসে শুধু জিগ্যেস, কে মেরেছে, দেখতে কেমন, আবার দেখলে চিনতে পারব কিনা, সাত সতের। আরে, চিনতেই যদি পারব, দেখেই যদি থাকব, তো ছেড়ে দিয়েছি তাকে? দু দুবার ঘটনা, তোমরা একটা পাহারার বন্দোবস্ত করতে পার না? নজর রাখতে পার না? কিছু না পার, দুটো আশা ভরসা তো দিতে পার? নাহ, নাহার, আমার মন উঠে গেছে আজ থানায় গিয়ে। বয়স যদি থাকত, দেশে গিয়ে আবার সব শুরু করবার মতো উপায় যদি থাকত, লাথি মেরে চলে যেতাম। ইয়াসমিন যদি ফিরে আসে, আসবে, কি বল?— এলে ওকে আমি ঢাকায় পাঠিয়ে দেব। মিয়া ভাইয়ের কাছে থাকবে। তারও মেয়ে আছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। মাহজাবীনকে পাঠিয়ে দেব। দু বছর পরে নাসরিনকেও। ও আমি কাউকে আর এখানে রাখব না!

ইতস্তত করে নাহার বলে, আর আমরা?

হঠাৎ শূন্য চোখে স্ত্রীর দিকে তায় আলি। তারপর দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নেয়। ব্রিফকেস খুলে টিকিট কাগজপত্র বের করে চশমা চোখে দিয়ে পড়বার চেষ্টা করেন। অল্পক্ষণ পরেই ধরা পড়ে, চশমার কাচ যেন অস্বচ্ছ হয়ে গেছে, ধোঁয়াটে লাগছে।

৮. মাহজাবীন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাহজাবীন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এক মুহূর্ত বাড়িতে ভালো লাগে না তার। আবার ইয়াসমিনের মতো তার পছন্দটা অস্পষ্ট নয়। ইয়াসমিন চায় বন্ধনহীন জীবন, শাসন নেই, বাবা-মা, এমনকি স্বামীরও নয়। বিয়ের কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। তবে, কাউকে ভালো লাগলে তার সঙ্গে বাস করতে আপত্তি নেই তার। তেমন ভালো লেগেছে, এখনো কেউ নেই অবশ্য! ইয়াসমিন ভালোবাসে গান, বন্ধুত্ব, পায়ে হেঁটে ভ্রমণ, যাযাবরের মতো খোলা আকাশের নিচে রাতবাস। জীবিকার জন্যে লেখাপড়াকে ঘৃণা করে, বিয়ের। জন্যে নিজেকে বড় করে তোলা তার কাছে কুসংস্কার বলে বোধ হয়। জীবিকা উপার্জনের একটা ধারণা তার আছে। সে কাঠমিস্ত্রি হবে এবং কেবল জানালাই বানাবে। তার মাথায় নতুন নতুন ডিজাইনের জানালা ঘোরে। নিজেকে সে কল্পনা করে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান জানালা নির্মাতা হিসেবে।

আর মাহজাবীন চায় যত শিগগির সম্ভব, সময়কে ঠেসে খাটো করে হলেও, ষোল বছর অতিক্রম করতে। তারপর সে বেরুবার স্বাধীনতা আদায় করে নেবে। বাবা মায়ের কাছ থেকে সে স্বাধীনতা না পাওয়া গেলে বিপ্লবী যেমন দেশত্যাগ করে, সে গৃহত্যাগ করবে। সে ডাক্তারের কাছে গিয়ে মাসের একুশ বড়ি ব্যবহার করবার ব্যবস্থা নেবে। তারপর কিছুদিন ছেলেদের সঙ্গে তারিখ করবে, হল্লা করবে, নাচ করবে, ছেলের গাড়িতে শেষরাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে, ছুটির দিনে দূরদূরান্তে যাবে, একদিন বাগদত্তা হবে, বিয়ে হবে, মাহজাবীনের নিজের সংসার হবে। সে পরিষ্কার জানে, রাড়ি থেকে এর কোনোটিই সম্ভব নয়। এমনকি তুচ্ছ সিগারেট পর্যন্ত সে খেতে পারবে না। তাই যতদিন তার মোল

বছর না হচ্ছে, চমৎকার অভিনয় করে যাচ্ছে বাড়িতে। সিদ্ধান্ত করে অভিনয় নয়, একটু একটু করে সহজভাবে সে এই কৌশলটি অবলম্বন করেছে।

বেরিয়ে সে চন্দনার বাড়ির কাছাকাছি যায়। চন্দনার কথাটা তখন মনে এসে ভালোই হয়েছে। বরং ওকে নিয়েই ইয়াসমিনের কাছে যাওয়া যাবে। অলবানি স্ট্রীট টিউব স্টেশনের একেবারে কাছে।

পথে লাইব্রেরি পড়ে। বই দুটো চট করে ফিরিয়ে দেয় মাহজাবীন। ফুটপাতে লাল টেলিফোনের বাক্সে ঢোকে। চন্দনাকে ফোন করে দেখে নেয়া দরকার, বাড়িতে আছে কিনা।

ফোন করতে ঢুকে, প্রথমে সে কাঁধের ঝুলি থেকে সিগারেট বের করে। নিপুণ হাতে ধরিয়ে লম্বা একটা টান দেয়। মাথাটা বেশ হাল্কা আর শরীরটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে তার।

চন্দা?

বীন?

হাঁ, বীন বলিতেছি। বাড়িতে আছ?

আছি।

তোমার পিতা মাতা?

তাহারা কাজে গিয়াছে। আটটায় ডিউটি শেষ হইবে। তুমি কোথায়?

নিকটেই। আসিতেছি।

চন্দা পৌঁলের বাবা-মা দুজনেই লন্ডন ট্রান্সপোর্ট বাসে কাজ করে, চন্দনা তাদের একমাত্র মেয়ে। ভালোই হলো, খালি বাড়িতে বসে মনের সুখে সিগারেট খাওয়া যাবে।

মিনিট খানেকের ভেতরেই মাহজাবীন পৌঁছে যায়। দরোজা খুলে দিয়েই দুই বন্ধু হেসে গড়িয়ে পড়ে। ঐ বয়সে এভাবেই হাসি পায়; এর বিশেষ কোনো কারণ থাকে না।

ভেতরে ঢুকে মাহজাবীন ব্যাগটা ধপ করে নামিয়ে রেখে সোফার ওপর দুপা তুলে জোড়াসন হয়ে বসে। নিজে আরেকটা সিগারেট ধরায়, চন্দনাকে দেয়।

না, ধন্যবাদ। আমি এই মাত্র একটি শেষ করিয়াছি।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে মাহজাবীন বয়সের তুলনায় বেশি সাবালক স্বরে বলে, ইহা কি সম্ভব?

কী?

পানীয় যাহাই হউক।

আমি চেষ্টা করিব।

চন্দনা কার্পেটের ওপর, মাহজাবীনের পায়ের কাছে বসেছিল। উঠে দাঁড়ায়। ড্রিংকস ক্যাবিনেটের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে, ড্যাডি চাবি দিয়া যায়।

তোমার চাবি নাই?

তাহা তোমাকে বলিব কেন?

মাহজাবীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে চন্দনার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ঈর্ষাও হয় তার। এই চন্দনা কী সুখে আছে! তার বাবা-মা একসঙ্গে কাজে বেরিয়ে গেছে। সারা বাড়িতে সে এখন একা। যা খুশি কর। তার বাবার আপিস বাড়ির মধ্যে। হতভাগ্য আর কাকে বলে! চন্দনা তো ইচ্ছে করলে বালক-বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করতে পারে। কী সৌভাগ্য!

চন্দনা বলে, তুমি এদিকে দেখিও না। ক্যাবিনেট খুলিতেছি।

ক্যাবিনেটটা দেহ দিয়ে আড়াল করে চন্দনা কী এক কৌশলে মুহূর্তের ভেতরে খুলে ফেলে।

কী পান করিবে? চাহিয়া দ্যাখো। তবে সামান্য দিতে পারিব, নহিলে ড্যাডি সন্দেহ করিবেন। মারধোর করিবেন।

মারধোর করেন?

হাঁ, প্রায়ই।

মাহজাবীনের চিত্ত লঘু হয়ে যায়। যাক, তাহলে ততটা সুখে চন্দনা নেই। অন্তত তার বাবা। গায়ে হাত তোলে না। সে উঠে এসে ক্যাবিনেটের ভেতরে সাজানো সারি দেওয়া। বোতলগুলোর দিকে পরীক্ষামূলক দৃষ্টিপাত করে। ঐ গেঁথে রাখে। তারপর বলে, সময় সংকীর্ণ। বেশিক্ষণ থাকিতে পারি না। আমাকে ভোদকার সহিত অনেকখানি লাইম। মিশাইয়া দাও।

শিস দেয় চন্দনা। বলে, কার কাছে শিখিয়াছ?

জন।

তারিখ করিয়াছিলে?

উহাকে ততটা পছন্দ করি না। আমাকে চুম্বন করিয়াছিল। জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। আমি তাহা রুঢ় মনে করিয়াছিলাম। আর বাহির হই নাই।

দুজনেই সুরা নেয়। মাহজাবীন আবার সোফায় গিয়ে জোড়াসন হয়ে বসে। আবার সে সিগারেট ধরায়। চন্দনা কার্পেটের ওপর, পায়ের কাছে বসে। মুখোমুখি হয়ে।

একের পর এক সিগারেট ধরাইতেছ?

হাঁ, একটি জোড়ের ভেতরে বর্তমানে আছি।

কী ব্যাপার। সঙ্গে একটি ভারি ব্যাগও দেখিতেছি। কী আছে উহাতে?

ইয়াসমিনের কাপড় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

বুঝিলাম না।

ইয়াসমিন বাড়ি ছাড়িয়াছে। আজ কন্যা দেখিবার জন্য এক ষাঁড়ের আসিবার কথা! ইহা ব্যতীত পথ ছিল না।

আবার শিস দেয় চন্দনা। জিগ্যেস করে, বাড়ির পরিস্থিতি কী?

মাম কাঁদিতেছে। ড্যাডি কাঁদিতেছে। উহারা বুঝে না। উহারা বাঙালিই রহিয়া গেল। আজ শুনিতেছিলাম আমাদের কোরান পড়াইবার কথা হইতেছে। উহারা কোরানকে সার্ফ সাবানের গুঁড়াতুল্য জ্ঞান করে। সমস্ত নির্মল বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে।

লম্বা একটা চুমুক দেয় গেলাশে মাহজাবীন। তালু জিভেয় টক করে শব্দ তুলে বলে, লাইম বেশি দিয়াছ। আমি কিঞ্চিত ভোদকা ঢালিয়া লই।

চন্দনা বলে, ইয়াসমিনকে দোষ দিই না। সে উত্তম করিয়াছে। আমারও হয়তো বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু আমি বাড়ি ছাড়িতে পারিব না।

কেন পারিবে না?

আমার সাহস হয় না। এই জন্যই আমার মৃত্যু হইবে। মহিষের মতো গন্ধযুক্ত কোনো অজানা ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে। না, আমি আর ভাবিতে পারিতেছি না।

এত সুযোগ থাকিতেও তুমি এত ভীতু, অবাক হইতেছি।

দুঃখিত স্বরে চন্দনা বলে, ড্যাডি আমাকে খুন করিতেও দ্বিধা করিবে না।

মাহজাবীনের ভাবনা হয়। চন্দনার জন্যে নয়, এত যার ভয়, তাকে নিয়ে অলবানি স্ট্রীটে যাওয়া বোধহয় আর হবে না। একা যাওয়া সে ভালো মনে করে না। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় সে কিছুক্ষণ থেকেই টের পাচ্ছে যে, ইয়াসমিনের অনুপস্থিতির প্রথম দিনে তার নিজের দীর্ঘক্ষণ একা বাইরে থাকাটা গোলমেলে হয়ে দেখা দিতে পারে। বাড়িতে কিছুক্ষণের ভেতরেই খোঁজ পড়বে। চন্দনা থাকলে, তাকে নিয়ে না হয় একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যেত, মাকে বলা যেত— দুজনে ইলিং ব্রডওয়ের বিপণী বিতান ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

মুশকিলের কথা।

মাহজাবীন নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্যটি করলেও চন্দনা সেটাকে তারই ওপর মন্তব্য বলে ধরে নেয় এবং বন্ধুর প্রতি আরো অন্তরঙ্গতা বোধ করে। চন্দনা বলে, তুমি আর খানিকটা পানীয় লও?

না।

বিপদ অবশ্য আসিয়া পড়িলে আমি শেষ চেষ্টা করিব। ততদিনে কোনো বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সহিত পালাইয়া যাইব।

মাহজাবীন অন্য কথা ভাবছে। সে বলে, চন্দনা, ভাবিয়াছিলাম তোমাকে লইয়া বাহির হইব।

তা থাক। আমাকে শীঘ্র বাড়ি ফিরিতে হইবে। তুমি একটা কাজ করিবে?

কী কাজ?

ইয়াসমিনের এই ব্যাগ লইয়া বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। ড্যাডি হয়তো ফিরিয়া আসিয়াছে। চোখে পড়িলে ওয়াটারগেট হইয়া যাইবে। ব্যাগটি তুমি রাখিবে?

হাঁ, রাখিব।

পরে লইয়া যাইব।

যখন খুশি লইও। ইয়াসমিন কোথায় আছে?

অলবানি স্ট্রীটে, সে অনেক দূর। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের নিকটবর্তী।

বালকবন্ধুর সহিত আছে?

না, আমি যতদূর জানি, তাহার কেহ নাই। ইয়াসমিন স্বপ্নজগতে বাস করে। সেই জগত স্বভাবতই নিঃসঙ্গ। সহসা সঙ্গী জুটে না। না, আমার মনে হয় না, ইয়াসমিনের দৃঢ় কোনো বালকবন্ধু আছে।

চন্দনা উঠে দাঁড়ায়। নিঃশ্বাস ফেলে বলে, চলিলে?

হাঁ। দাঁড়াও, আরেকটি সিগারেট শেষ করিয়া লই। বাড়িতে ঢুকিলে তো আর সম্ভব হইবে না।

আমাকে দুইটি ধার দাও। আমার ফুরাইয়া গিয়াছে। ড্যাডির পকেট হইতে একটির বেশি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মাহজাবীন তাকে ব্যাগ রাখবার পুরস্কার হিসেবে গোটা প্যাকেটটাই দিয়ে দেয়। ব্যাগটি লুকাইয়া রাখিও।

৯. এক প্রস্থ ধোঁয়া গেলার পর

এক প্রস্থ ধোঁয়া গেলার পর অলবানি স্ট্রীটের তেতালা এখন কিছু সময়ের জন্যে না মর্তে না সুনীলে। ভিনসেন্ট দৃশ্যতই প্রত্যেকের ওপর বিরক্ত হয়েছে। তার বিরক্তির কারণ, একই সঙ্গে সকলের ভাড়ার তলানিতে এসে ঠেকেছে, সেটা তাকে আগে জানান হয় নি কেন? গ্যাবি, তার বান্ধবী এবং শয্যাসঙ্গিনী, তাকে পর্যন্ত সে একটা লাথি মেরেছে। এমন কিছু প্রচণ্ড লাথি নয়, ইয়াসমিন বাধা দেয়ায় গুরুত্বটা বেশি পেয়ে যায়। ভিনসেন্ট ক্ষণকাল এ ইচ্ছা লালন করে, ইয়াসমিনকেও লাথি মারবে কিনা।

নিমিলীতি চোখে মার্ক গিটার হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিল। খুব অল্পটানেই তার দশা হয়ে যায়। সবার থেকে এমনিতেই সে আলাদা, দশা-র পর তাকে ভিন্নগ্রহের বলে বোধ হয়। ইয়াসমিন তবু তার কাছেই আসে, কাঁধ ঘেষে বসে। অন্য কারো কাছে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। গ্যাবি বাথরুমে গিয়ে সেই যে স্নান করছে, বেরুবার নাম নেই। ভিনসেন্ট কুদ্ধ। পিটার। আর কোকো পরস্পর জিহ্বা লেহন করছে সবাইকে অনুপস্থিত গণ্য করে। প্যাম আর জো, দুজনে মুখোমুখি জোড়াসন হয়ে বসে দীর্ঘতর ধ্যানের অভ্যেস করছে।

মার্ক। মার্ক সাড়া দেয় না। দ্বিতীয়বার ডাকতে সে একটা হাত ইয়াসমিনের হাতের ওপর আলতো করে রাখে।

মার্ক, সে কেন লাথি মারিল?

উহা তাহার চুম্বন।

বুঝিতে পারি না।

উহা আদর।

এ কীরূপ আদর? লাথি হয় লাথি। নয়?

হাঁ, লাথি হয় লাথি, চুম্বন হয় চুম্বন এবং ভিনসেন্ট হয় ভিনসেন্ট।

ইয়াসমিন খানিকটা ভীত চোখে দূরে ভিনসেন্টের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে। এই ঘণ্টাখানেক আগেও জন্মগ্রহণের যে অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, তার সৌন্দর্য আবিষ্কার করে সে মুগ্ধ হয়েছিল। এখন সে মুগ্ধতাবোধে যেমন সূক্ষ্ম একটা চির ধরে যায়, তেমনি ভিনসেন্টও অন্য কোনো বালক বলে মনে হয় তার।

মার্ক, আমি পছন্দ করিতে পারিলাম না।

গাঁজার সরবরাহ পর্যাপ্ত যতক্ষণ, ভিনসেন্ট আকর্ষণীয়। তাহার তুলনায় প্রতিটি ব্যক্তি কর্কশ। গাঁজা ফুরাইল, ভিনসেন্ট ক্রুদ্ধ হইল।

আমি ভিনসেন্টকে তিরস্কার করিব।

না, করিবে না।

কেন?

তুমি অনুতপ্ত হইবে।

কেন? অনুতপ্ত হইব কেন?

এই গৃহ তাহার।

গৃহ তাহার কেন হইবে? এ কীরূপ কথা বল। গৃহ সকল সন্তানের।

অধিকারবোধের পুরাতন ধারণা চলিয়া গিয়া নতুন ধারণা স্থান করিয়া লয়।

স্বীকার করি না।

শূন্যতা যে প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

তাহা হউক। গৃহ ভিনসেন্টের হইল কী প্রকারে?

সে এখানে প্রথম দখল লইয়াছিল। তাহারই নিমন্ত্রণে অন্য সকলে আসিল। যাহারা ভিন্ন। গৃহের সন্ধান পায়, তাহারা চলিয়া যায়।

উত্তম করে।

সেখানেও তাহারা অপর কোনো ভিনসেন্টের অধীনস্থ হয়।

সামান্য গাঁজার জন্য ভিনসেন্ট লাথি মারিল। গ্যাবি সহ্য করিল?

গ্যাবি শয্যায় ইহার প্রতিশোধ লইবে।

ইয়াসমিন মনের ভেতরে দ্রুত চিন্তা করে।

মার্ক ধীর লয়ে হেসে উঠে বলে, নারী স্বাধীনতার কালেও নারীর মারাত্মক অস্ত্রটি এখনো শয্যাতেই তাহাদের ব্যবহার করিতে হয়।

ইয়াসমিন জামার একটা বোতাম খোলে, নিজের বুকের ভেতরে একটা হাত ঢুকিয়ে দেয়।

কী করিতেছ? আমারই ওপর অস্ত্র প্রয়োগ করিবে নাকি? মার্ক কৃত্রিম আঁতকে উঠে বলে।

না, ইহা দ্যাখো।

ইয়াসমিন বুকের ভেতর থেকে সোনার লকেট বের করে। আবুধাবি থেকে তার বাবা এটা আনিয়ে দিয়েছিলেন। খুব ছোট বাঁধানো বইয়ের মতো দেখতে। সোনার ওপর মিনা করা নক্সা। ভেতরে পুরো কোরান শরিফের অনুবীক্ষণে দেখা সম্ভব এত ক্ষুদ্র অনুলিপি।

মার্ক মুগ্ধ হয়ে যায়।

সুন্দর!

ইয়াসমিন চেন ঘুরিয়ে হুকের মুখ বিযুক্ত করে। ঝপ করে হাতের তেলোর ওপর লুটিয়ে পড়ে সোনার চেন লকেট। দূরে ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে সে একবার। মার্ক বিস্মিত হয়ে বলে, খুলিলে কেন?

ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই।

ইয়াসমিন উঠে গিয়ে ভিনসেন্টকে বলে, এই লও।

ভিনসেন্ট কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে বস্তুটার দিকে, তারপর খপ করে হাতে তুলে নেয়।

ইয়াসমিন বলে, ইহা স্বর্ণ। কোথায় বিক্রয় করিবে জানি না। প্রথম দিনেই কলহ আমি চাই না। আমরা আনন্দ করিব।

ভিনসেন্ট দাঁড়ায়।

হাঁ, তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। আমাকে পূর্বাহ্নে বলিলেই ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। যাহা হউক, আমি আসিতেছি।

ভিনসেন্ট দ্রুত ঘর ছেড়ে যায়।

ইয়াসমিন তখন দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে।

আমাকে কেহ একটা সিগারেট দিবে?

কোকোর মুখ থেকে মুখ সরিয়ে পিটার বলে, দৈর্ঘ এবং আয়তন সম্পর্কে ধারণা দিলে, বিবেচনা করিতে পারি।

কোকো তার চুল ধরে নিজের মুখের কাছে আবার টেনে আনে। ইয়াসমিনের হঠাৎ ইচ্ছা হয় পিটারকে লাথি মারে। এবং মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ হয়। ভিনসেন্ট যে গ্যাবিকে লাথি মেরেছিল, সেটা আর এখন এতখানি পীড়াদায়ক মনে হয় না। আসলে সে

নিজেও জানে না, সকালে এবং দুপুরে দুইপ্রস্থ পায়া নেবার পর সে এবং সকলেই কী ক্ষিপ্রগতি উভচর যুক্তিবোধের জ্যোৎসক্রান্ত প্রান্তরে পৌঁছে গেছে।

ইচ্ছাই বা অপূর্ণ থাকে কেন? ইয়াসমিন উঠে গিয়ে পিটারের পাছায় লাথি কসিয়ে দেয়।

বলে, দৈর্ঘ এবং আয়তন জানিতে চাও বটে। তবে তোমারটা দেখিয়া বিবেচনা করিব, চলিবে কি না।

প্যাম ওদিক থেকে বিরক্তিসূচক শব্দ করে ওঠে, আহ, তোমরা কী লাগাইলে? আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিলে?

জো বলে, ইয়াসমিনের সঙ্গে কে পারিবে? পিটার? শুস।

প্যাম তখন জো-কে নিয়ে পড়ে।

এই তোমার ধ্যান? তুমি সব শুনিতেছিলে। আমি মন্দিরে গিয়া গুরুকে বলিয়া দিব।

ইয়াসমিন হেসে উঠে বলে, কেন? গুরুকে নালিশ দিবে কেন? শয্যায় অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। জো সিধা হইবে।

প্যাম তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে আবার ধ্যানে বসে।

মার্ক, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।

সংগীত ছাড়া আপাতত আমার কাছে দ্বিতীয় কোনো আহার্য নাই।

তুমি কি অনাহারে থাকিবে?

হাঁ, অন্য ব্যবস্থা না হইলে, সন্ধ্যাবেলায় চ্যারিং ক্রস যাইব। সেখানে পাদ্রীরা সুপ বিতরণ করিতে প্রত্যহ আইসে।

তোমার কি অর্থ নাই?

ছিল, ফুরাইয়া গিয়াছে। সোমবারে ভাতা তুলিব, তবে খাইব।

ইয়াসমিন নিজের ক্ষিদে সত্ত্বেও মার্কের ক্ষিদের জন্যে কষ্ট পেতে থাকে। ভিনসেন্ট লকেট বেচে সব টাকাই গাঁজায় খরচ করবে, না খাবারও আনবে— সেই সংশয়ে কিছুক্ষণ সে দোলে। প্রার্থনা করে, ভিনসেন্ট যেন কিছু খাদ্য আনে।

গান শুনিবে, ইয়াসমিন? তবে শোন। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যাইবে।

১০. শাপলা ট্রাভেল এজেন্সির সাইনবোর্ড

শাপলা ট্রাভেল এজেন্সির সাইনবোর্ড দেখেই ডাঃ বারী বলে ওঠে, আরে, এখানে নাকি? মেয়ে কার? আলি সাহেবের?

ডাঃ ইউনুস ভাইয়ান ফর্সা মানুষ। লজ্জায় রাঙ্গা হলে সহজে বুঝা যায়। সেটা গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে বলে, হাঁ। বড় মেয়ে।

আশ্চর্য, ফি বছর টিকিট নিচ্ছি আলি সাহেবের কাছ থেকে, একবারও তো শুনি নি, মেয়ে আছে।

যুক্তিটা দুর্বল। টিকিট নিলেই টিকিটদাতার পারিবারিক সব খবর ক্রেতার জানা হয়ে যাবে, বা হওয়া উচিত, এটা কোনো কথা নয়। বারী নিজেও সেটা অন্য সময় হলে বুঝত। কিন্তু, প্রতি বছর সে দেশে গেছে পাত্রী খুঁজতে, সে পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার এই আবিষ্কার সত্যি তাকে ক্লিষ্ট করে। রুহুল কুদুস একবারে পাশ করেছে, সে পারে নি, দুপুরে সেটা মনে করেও এখনো বুকের ভেতর খচখচ করছে।

গাড়ি থামিয়ে বারী গম্ভীর মুখে বেরিয়ে আসে। ভাইয়ান থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। ভাইয়ানের একবার মনে হয়, তাকে না বলে এতদূর টেনে আনাটা বোধহয় ঠিক হয় নি। লোকটা সত্যি সত্যি রাগ করেছে। পুষিয়ে দেবার জন্য সে খুব চটপটে হয়ে বলে,

বেশিক্ষণ বসব না। এক নজর দেখা, এই তো! আপনার ওপর খুব ডিপেন্ড করছি। আপনিই দেখবেন, আপনি বললে করব, নইলে নয়।

তেলটাতে বিশেষ কাজ হয় বলে মনে হয় না। বারী প্রায় স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করে, আমি নিজের ওপর স্বয়ং নির্ভর করতে পারি না।

পাশাপাশি দুটো দরোজা। বাড়ির ভেতরের ওপর তলায় যাবার দরোজাটা নিরেট কাঠের। তার পাশেই আপিসে ঢোকার দরোজা স্বচ্ছ কাচের। ভাইয়ান বারীকেই সমুখে ঠেলে দেয়। আপিস থেকেই মিষ্টার আলি দেখতে পেয়েছিলেন ওদের। স্বাভাবিক পরিস্থিতি হলে সাগ্রহে উঠে এসে আপ্যায়ন করে ভেতরে আনতেন, এখন ওদের দেখা মাত্র তার মনে হলো, যদি পালিয়ে যেতে পারতাম। ইয়াসমিনের অনুপস্থিতির কী ব্যাখ্যা দেবেন বহু ভেবেও তা ঠিক করে উঠতে পারেন নি। শেষে ভবিষ্যতের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন নিজেকে। এটুকু স্থির করেছেন, ইয়াসমিন বাড়িতে নেই বলবেন, বাকিটা অবস্থা দেখে বানিয়ে নেবেন।

এই মুহূর্তে তার মনে হলো কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকাই ভালো। তিনি কাচের দরোজার ওপারে ওদের দেখেই বিরাট এক ফাইল খুলে বসেন।

দরোজা ঠেলে প্রথমে ঢোকে বারী, পেছনে ভাইয়ান।

বারীকে দেখে অবাক হন আলি। ভাইয়ানের দিকে চোখ যেতে চায় তার, তিনি শাসন করে রাখেন। হাত বাড়িয়ে দেন বারীর দিকে।

আরে, আপনি, আসসালামুআলাইকুম, আসুন, আসুন। ভালো আছেন? ম্যানচেস্টারেই আছেন? এমনভাবে কথা বলেন তিনি যেন দ্বিতীয় আর কেউ নেই সেখানে।

বারী পরিচয় করিয়ে দেয়।

ইনি আমার বন্ধু ডাঃ ইউনুস ভুইঞা, বেলশিলে থাকেন।

মিস্টার আলি একটা মিথ্যা কথা বলেন, ও তাই তো! আপনার আসবার কথা, অপেক্ষাও করছি, অথচ বুঝতে পারি নি। বারী সাহেবকে দেখে মনে করেছি, টিকিটের ব্যাপার কি দেশেটেশে যাচ্ছেন, জিনিস কেনা কাটা আছে। বসুন, বসুন।

দুজনে বসে। আপিসের এক পাশে জোড়া একটা সোফা, সেখানেই বসে তারা। মিস্টার আলি ফাইল বন্ধ করে ক্যাবিনেটে তুলে রাখতে রাখতে বলেন, ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার সাহেব।

দুজনেই ডাক্তার, তবু বুঝতে কষ্ট হয় না, উদ্দিষ্ট হচ্ছে ডাঃ বারী।

ভাইয়ান তখন থেকে মুখে একটা স্থির বিস্তৃত হাসি ঝুলিয়ে বসে আছে। বসে আছে কিন্তু স্বস্তি নেই, একবার পা লম্ব করছে, ভালো লাগছে না; পা ভাজ করছে, আরাম বোধ হচ্ছে না; আবার ডান দিকে একটু কাত হচ্ছে, হাতলে লাগছে; তখন আবার সোজা হচ্ছে; আবার গোড়া থেকে শুরু করছে।

বারী বলে, কেন খারাপ কেন?

আলি এসে চেয়ার টানেন, টেবিলে এক হাত রাখেন, ঠেস দিয়ে বসেন।

খারাপ হবে না? দেশে লোক যাচ্ছে কোথায়? সবাই তো আসছে। বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছে। ফেরত যাবার সংখ্যা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে, ডাক্তার সাহেব। আমরা তো এই ব্যবসাই করি, স্ট্যাটিকটিক্স আমাদের কাছে আছে।

বারী যতখানি চিন্তিত নয়, তার চেয়ে বেশি চিন্তিত মুখ করে বসে থাকে। একটু পর বলে, উনি বেলকিশ থেকে আসছিলেন, পথে আমাকে তুলে নিলেন। আমি কিছু জানতাম না।

ও।

তাও উনি ওখানে আমাকে কিছু বলেন নি। পথে শুনলাম। তা আপনার ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে, আবার ঠিক হয়ে যাবে। ব্যবসায় ওঠানামা তো আছেই। কী বলেন ডাক্তার সাহেব? ভাইয়ান হকচকিয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, হাঁ, তাতো বটেই।

দু মিনিটও হয় নি, এর ভেতরই অধির বোধ করছে সে। কখন মেয়ে দেখা যাবে? ভেতরে নিয়ে যাবে? না এখানেই দেখাবে? মেয়ের সঙ্গে আলাদা একটু কথা বলা যাবে তো? মেয়ে স্বয়ং না হোক, মেয়ের ছোট বোন দুটিকেও একবার দেখা যাচ্ছে না কেন? পাত্র বাড়িতে এসেছে, তাদের কি কোনো কৌতূহল নেই!

আলি দু হাতের করতল চিৎ করে বলেন, এবার নামারই পালা, বুঝলেন? বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি আপনি তো প্রত্যেক বছরই যাচ্ছেন, আপনিই ভালো বলতে পারবেন মানুষের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এতদিন শিক্ষিতলোক, দেশের উপকারে আসবে, এই জানতাম, এখন। দেখছি, শিক্ষিত হলেই বাইরে ছোটে না। আর শিক্ষিতদেরই বা দোষ দেই কেন? মিডিল ইস্টে আপনার কী বলে, সাধারণ লোক, মজুর, ড্রাইভার, বাবুর্চি ছুটছে না?

বারী এখানে বাধা দেয়।

একটা তফাত আছে আলি সাহেব। ওরা যারা যাচ্ছে, দেশে গিয়ে তো কয়েকবারই দেখলাম, দু হাতে টাকা উপার্জন করে, জিনিসপত্র কিনে দেশে ফিরছে, দেশে জমি কিনেছে, বাড়ি কিনেছে। আর শিক্ষিত লোক, তারা রোজগার করে বিদেশেই খরচ

করছে, বিদেশেই বাড়ি গাড়ি করছে। আমরাই বা কী করছি? এই যে ভাইয়ান সাহেব, তা আপনার দশ বছর হয়ে গেল না? আমার তো তারো বেশি, আমরা এখানে পড়ে আছি, দেশে যাব, দেশে গেলে আমারই সমসাময়িক ডাক্তারেরা সব পোস্ট দখল করে বসে আছে, কেউ মন্ত্রী হয়েছে, কেউ গুলশানে বাড়ি টাড়ি করে ফেলেছে, আমরা গেলে কনুই মেরে বার করে দেবে, দেশে যাচ্ছি না তা আপনার কথাই ঠিক, দেশে কেউ আর ফিরে যাচ্ছে না।

বারীর ধারণা, এবং তার আশেপাশের বন্ধু বাঙালি ডাক্তারদের ধারণা, সে খুব বলিয়ে কইয়ে লোক, রাজনীতিও খুব ভালো বোঝে। তাই ভাইয়ানের মতো অনেক ডাক্তারই তাকে কাজ কর্মে সঙ্গে রাখে। তার কথার তোড়ে গরম বোধ করে। আসলে, বারী যে এক কথা থেকে আরেক কথায় লাফ দিয়ে যায়, দুটো কথার ভেতরে যুক্তির ফাঁক গমগমে আওয়াজ দিয়ে ভরিয়ে দেয়, এটা হঠাৎ কারো চোখে পড়ে না। তার কথায় শেষে সকলেই, বুঝুক আর না বুঝুক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাতে হয়।

অভ্যেস বশে ভাইয়ানও চিন্তিত মুখ সৃষ্টি করে।

আলি সেটা লক্ষ করেন। তার চৈতন্য হয়, মেয়ে দেখতে এসেছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর মোটেই শোভন দেখাচ্ছে না।

আরো কিছু সময় নেবার জন্যে, পরিস্থিতি সামাল দেবার উপায় ভেবে নেবার জন্যে আলি এই আলোচনার জের টেনে বলেন, গুলশানের কথা বলছিলেন, ডাক্তার সাহেব। সেদিন

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিমান আপিসে দেখা। মাস তিনেকের জন্য এসেছেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তিনি এক কথা বললেন।

বারী ভ্রূ তুলে অপেক্ষা করে। দেয়ালে প্যান আমিরিকান-এর এক পোস্টারে সহাস্য এক তরুণীর জীবন্ত ছবি দেখে অজান্তে তার হাত উঠে যায় টাকে। বার দুয়েক বুলিয়ে নেয়। আলি বলেন, সেই ভদ্রলোক বলছিলেন, গুলশানে আর একটি বাড়িও থাকবে না।

কেন?

পাবলিক একটা একটা করে ইট খুলে নেবে। বেশিদিন আর বাকি নেই।

রেভেলেউশন তো একটা হওয়া দরকার, আলি সাহেব। তবে, হবে বলে আমার মনে হয় না। বাঙালিকে কিছুটা চিনি তো? হোটেলের সামনে ফেলে দেওয়া খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে, হোটেলে ঢুকে কেড়ে খাবে না। এই হচ্ছে আপনার বাঙালি। নাহ্, আপনার ভদ্রলোকের কথা মানতে পারলাম না। হলে তো ভালোই।

ভাইয়ান এবার স্থির হয়ে গেছে। প্রথম ঢুকেই যে উত্তেজনা বোধ করছিল, কিছুতেই শান্ত হয়ে বসতে পারছিল না, এখন সে যেন অন্ধ নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে।

আলি উঠে দাঁড়ান।

ওপরে একটা খবর দিয়ে আসি।

ডাঃ ইউনুস ভাইয়ানের বুকের ভেতরটা ধ্বক করে ওঠে। ট্রাউজারের ভেতরে শিরশির করতে থাকে। একাধিক শ্বেতাংগিনীর সাহচর্য পাবার পরও, তার নিজেরই বিশ্বাস হয়ে যায়, সে এখনো কুমার।

১১. অত্যন্ত নিশ্চিত ও মূল্যবান সামগ্রী

ইয়াসমিন, তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন কর। ইহা অত্যন্ত নিশ্চিত ও মূল্যবান সামগ্রী। বহুকষ্টে জোগাড় করিয়াছি।

ভিনসেন্টের নির্দেশে তার ডান পাশে গিয়ে ইয়াসমিন বসে। বাম পাশে গ্যাবি, তারপরে পিটার, কোকো, জো, প্যাম, মার্ক, মার্কের পরেই ইয়াসমিন–এইভাবে বৃত্ত রচনা করে বসেছে ওরা। ইয়াসমিন ভেবেছিল, বস্তুটা গাঁজা জাতীয় কিছু হবে, সিগারেটের মতো টানতে হবে। কিন্তু না, আয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভিনসেন্ট দ্রুত হাতে অথচ সাবধানে একটা ছোট গোল শিশি বের করে, তার ভেতরে শাদা গুঁড়ো। অতি সূক্ষ্ম সেই গুঁড়ো। পাউডারের মতো।

ইহা তুমি পছন্দ করিবে।

ধূপদানেব মতো ছোট্ট একটা জিনিস বের করে ভিনসেন্ট। হাত বাড়ায়। কেউ তাকে একটা দেশলাই দেয়।

ইহা নাসিকা দিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

ভিনসেন্ট ধারাবিবরণী দিয়ে চলে। ধূপদানের মতো বস্তুটির ভেতরে গুঁড়ো সামান্য একটু ঢেলে, শিশির মুখ বন্ধ করে সে।

তুমি প্রস্তুত, ইয়াসমিন। পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া, শ্রবণ কর। দুই হাত পেয়ালার মতো করিবে। পাত্র সমুখে ধরিব আমি, তুমি চক্ষু পুঁজিয়া, পাত্রটিকে করতলের দুই পেয়ালার ভেতর লইয়া ঘ্রাণ গ্রহণ করিবে। অতঃপর, পাত্রটিকে গ্রহণ করিয়া তোমার দক্ষিণ পাশে যে উপবিষ্ট তাহার সম্মুখে ধরিবে। সে ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া পাত্রটি অনুরূপভাবে তোমার হাত হইতে লইবে। এইভাবে আমার কাছে সর্বশেষে ফিরিয়া আসিবে। আরম্ভ করিতেছি। ইয়াসমিন চোখ বুজে অপেক্ষা করে। ফস করে দেশলাই জ্বলে ওঠার শব্দ পায়। মুহূর্তকাল পরেই ভিনসেন্ট ফিসফিস করে বলে, লও।

ইয়াসমিন দুই করতল পেয়ালার মতো করে, চোখ বুজে থেকেই পাত্রটিকে ঘিরে মুখ নামিয়ে আনে, ঘ্রাণ নেয়, সাধারণ ধোঁয়ার মতোই মনে হয় তার, পাত্রটিকে ধরে এবং ডানপাশে মার্কের সম্মুখে ধরে। মার্ক দ্রুত ঘ্রাণ নিয়েই পাত্রটি তার হাত থেকে সরিয়ে নেয়।

প্রথমে কিছুই মনে হয় না ইয়সমিনের। চোখের ভেতরে ঘন বেগুনি রঙটা স্থির হয়ে থাকে। সেখানে ভিন্ন রঙের কোনো চিড় ধরে না। সাধারণ অবস্থায় চোখ বুজে থাকলে, চোখের ভেতরে রঙ যেমন সমুদ্র তরঙ্গের মতো ফুলে ফুলে ওঠে, তাও ওঠে না। সব কিছু স্থির এবং স্বাভাবিক মনে হয়। তবু সে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে হঠাৎ কোনো দীপ্তির, বিদ্যুতের, স্তব্ধতার অথবা সংগীতের জন্যে। পাত্র আবার তার কাছে ফিরে আসে।

আবার সে ঘ্রাণ নেয়। প্রথমে হয়তো নতুন বলে ভালো করে নিঃশ্বাস টানে নি, এবার সে বুক ভরে ধোঁয়া নেয়। অচিরে তার মনে হয়, বড় দ্রুত পাত্রটি তার কাছে ঘুরে ঘুরে আসছে। অবিরাম সে ঘ্রাণ নিচ্ছে। তার দেহ অতি ধীরে সম্মুখের দিকে চলছে, ফিরে আসছে, দুলছে, ফিরে আসছে।

ইয়াসমিন।

বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত সেই ডাকে সে হঠাৎ আবিষ্কার করে এতক্ষণ এক ভয়াবহ স্তব্ধতার ভেতরে সে ছিল। সেই স্তব্ধতা এখন অপার্থিব অনুরণনে নীলবর্ণ ধারণ করছে এবং তার নামের ধ্বনিপর্বগুলো দীপ্তিময় গোলকের মতো ওঠা নামা করছে।

ইয়াসমিন, শুনিতে পাইতেছ?

হাঁ, ভিনসেন্ট, আমি শুনিতে পাইতেছি।

নীলবর্ণ দেখিতে পাও?

হাঁ। ঘন নীল।

উহা আকাশের নীল।

কয়েকটি গোলক দেখিতেছি।

শীঘ্রই উহারা একটি গোলকে পরিণত হইবে।

হাঁ, এখন একটি গোলক দেখিতেছি।

তুমি গোলকের দিকে তাকাইয়া থাক।

হাঁ, আমি তাকাইয়া আছি। আমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে।

তুমি নতুন চক্ষু প্রাপ্ত হইবে।

গোলক বৃহৎ হইতেছে।

হাঁ, লক্ষ করিয়া দ্যাখো, নীল আর নাই।

নীল আর নাই।

আমার হস্ত ধারণ কর।

করিলাম।

তোমার সম্মুখ ভাগ এখন ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ।

হাঁ, অন্ধকার।

চক্ষু খুলিও না, জাগতিক চক্ষু আর তোমার কাজে লাগিবে না। তোমার নতুন চক্ষু দিয়া মহাশূন্যের নিস্তব্ধ অতল কৃষ্ণ শূন্যতা প্রত্যক্ষ কর।

করিতেছি।

তোমার দুই পার্শ্ব দিয়া সেই অসীম শূন্যতা প্রবল বেগে বহিয়া যাইতেছে।

কোথায় যাইতেছে?

এক শূন্যতা হইতে আরেক শূন্যতায়।

আমি গতি অনুভব করিতেছি, ভিনসেন্ট।

উত্তম। তুমি মুক্তি পাইয়াছ।

আমি ছুটিয়া যাইতেছি।

উত্তম। উত্তম।

আমার ভয় করিতেছে।

ইয়াসমিন, ভীত হইও না। আমার হস্ত ধারণ কর।

আমি কোথায়?

একটি চন্দ্রযানে।

চন্দ্রযান?

হাঁ, তুমি এখন চন্দ্রযানে, তুমি এখন দীপ্তিমান গোলকের দিকে ধাবিত হইতেছ, পৃথিবী তুমি পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ।

আমি সেখানে ফিরিতে চাহি না।

তবে তুমি ফিরিবে না।

আমি গতির বেগ অনুভব করিতেছি। এই গতি আমি হারাইতে চাহি না।

তবে তুমি হারাইবে না। আমার দেহের ভেতরে তীব্র আনন্দ কল্লোলিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে। আমার রক্তপ্রবাহ আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। আমার করোটি হইতে পূর্ণচক্ক নির্গত হইতেছে। আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। আমি আলোক ভিন্ন কিছু দেখিতেছি না। বিশুদ্ধ সেই আলোক কাহাকেও আলোকিত করে না। আমি সেই আলোকের ভেতরে লীন হইয়া যাইতেছি। আমার চন্দ্রযান আলোক নির্মিত বোধ হইতেছে; আমি অবতরণ করিতে চাহি না, আমি অবতরণ করিতে চাহি না।

১২. আপিস ঘরে বারী আর ভাইয়ান

আপিস ঘরে বারী আর ভাইয়ানকে রেখে ওপরে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা রাখতেই মিস্টার আলির মাথায় বিদ্যুতের মতো বুদ্ধিটা খেলে যায়। এত সহজ বুদ্ধিটা আগে কেন মাথায় আসে নি, ভেবে তিনি অবাক হন। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে নাহারকে ফিসফিস করে বলেন, ইয়াসমিনের কথা তোলার দরকারই নেই। মাহজাবীনকে দেখিয়ে দাও।

কী বলছ?

আহ, অসুবিধে কী?

বীনার বয়স মাত্র পনের। ওকে তুমি বিয়ে দেবে?

তা নয়, তা নয়। মেয়ে দেখতে এসেছে, মেয়ে দেখে যাক। অসহিষ্ণুভাবে আলি হাত নাড়েন। বুদ্ধিটা নিজের কাছেই এত ভালো লেগেছে, মুক্তি পাবার এত নির্বিঘ্ন পথ পেয়ে গেছেন, যে সেটাকে ব্যবহার না করা পর্যন্ত তার ভেতরে উত্তেজনা কাটছে না। তিনি বলেন, মাহজাবীনকে এখন বিয়ে দেব কেন? দেখে যাবার পর জানিয়ে দেব, ছেলে আমার পছন্দ হয় নি।

এবার কথাটা কিছু মনঃপুত হয় নাহারের। আবার সন্দেহও দেখা দেয়।

মেয়ের নাম তো ছেলে জানে।

কী আর জানে? অত কি আর লোক খেয়াল রাখে? একবার দুবার শোনা? ভাববে, বড় বোন ছোট বোনের নাম গুলিয়ে ফেলেছে। নাও চটপট কর। আমি ওদের ওপরে নিয়ে আসি। মাহজাবীনকে বল, চা ও-ই দেবে।

বীনা যদি বেঁকে বসে।

আহ, ওকে এসব বলতে যাবে কেন? ও কিছুই জানবে না। চা-টা দেবে, একটু কথা বলবে, হয়ে গেল। এ কি আর দেশের মেয়ে দেখা যে সাজিয়ে গুছিয়ে দেখান? আর সে রকম তো কোনো কথাও ছিল না। ছেলে আসবে, সবার সঙ্গে দেখা হবে, সেই সঙ্গে মেয়েকেও দেখবে, আমরাও ছেলে দেখব, এইতো?

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান আলি।

ভেতরে এসে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অপ্যায়নের হাসি ফুটিয়ে বলেন, আপনারা তাহলে ওপরে আসুন। একটু চা খাবেন।

আপিস ঘর বন্ধ করেন না আলি। ভেতর থেকে শুধু হাতল-তালাটা ঘুরিয়ে দেন। ইচ্ছেটা, ওদের ওপরে বসিয়ে নিচে নেমে আসবেন। এখনো আপিস বন্ধ করবার সময় হয় নি, তাছাড়া, তিনি একটা মিথ্যের ভেতরে উপস্থিত থাকাটা ভালোও বোধ করছিলেন না।

ওপরে নিজেদের শোবার ঘরটাই বসবার ঘর। সেখানে বারী আর ভাইয়ানকে বসিয়ে নাহারকে ডেকে আনেন। আলাপ করিয়ে দেন।

তুমি ওদের চা-টা দাও। মেয়েদেরও ডাক, তারাও বসুক। আপনারা বসুন, আমার আবার ক্লায়েন্ট একজন আসবে। নিচে থাকতে হয়। চা খেয়ে নিচেই আসুন তাহলে। আপনাদেরও তো সময় নেই বলছিলেন।

ভাইয়ান বলে, না, সময়, সময় আর কী।

আলি চাইছিলেন তাড়াতাড়ি বিদায় করতে। ভাইয়ানের মুখে অনির্দিষ্ট কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্যে ভয় হয় তার। যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণই বিপদ। হেসে তিনি বলেন, তা বেশ, বেশ তো। স্ত্রীকে বলেন, এদিকে শোন।

রান্নাঘরে নাহারকে তিনি বলেন, মাহজাবীনকে ডাকবার আগে, ডাক্তারকে বোলো, মেয়েকে আমরা বলি নি কিছু। তাই, সে রকম আভাষ যেন না দেয়। আর মাহজাবীনকেও বেশিক্ষণ সামনে থাকতে দিও না। বুঝলে?

স্ত্রীকে সাগরে ফেলে তিনি নিচে নেমে যান।

পেছন থেকে নাহার বলে, তুমি চা খাবে না?

বড় আকুল শোনায় তার কণ্ঠস্বর। স্বামী থাকলে সে ভরসা পেত। তাই শেষ চেষ্টা করে। আলি শুনেও কোনো উত্তর না দিয়ে আপিস ঘরে গিয়ে ঢোকেন। ভেতরটা ভয়াবহ রকম শূন্য লাগে তার। কোথায় যেন নিজেকে অপরাধী মনে হয়। ব্যর্থতাবোধ বাদুরের মতো ঝুলে থাকে। দুহাতে মাথার দুপাশ ধরে তিনি কতক্ষণ বসে থাকেন, চেতনা থাকে না। তারপর হঠাৎ যখন বাস্তবে ফিরে আসেন, ইয়াসমিনের জন্যে প্রচণ্ড একটা ব্যথা অনুভব করেন তিনি। কোথায় তিনি ভুল করেছেন? কী তিনি মেয়েকে দিতে পারেন নি? কোন তীব্রতর আকর্ষণে সে তাকে ত্যাগ করল? যদি বা চলেই গেল, খবর দিল না কেন? তাকে তিনি স্নেহ দেন নি? শিশুকালে বুকের পরে রেখে রাত কাটিয়ে দেন নি? ইয়াসমিন কি বোঝে না, সে ভালো আছে কি না শুধু একটু জানার ভেতরে এখন তার পিতার জন্যে সমস্ত সঞ্জীবন?

খণ্ড খণ্ড ছবিগুলো তার চোখের ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে সরে যায়। সাতষট্টি সালে প,আই.এ-র লন্ডন আপিসে বদলী হয়ে এলেন। প্লেন থেকে নামছেন। বিয়ের পর সেই তার একা এতদূর ভ্রমণ। নাহারের জন্যে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি শূন্য বোধ করতেন ইয়াসমিন আর মাহজাবীনের জন্যে। মাহজাবীন তখন তিন, ইয়াসমিন পাঁচ। করাচিতে ফেলে এসেছিলেন তিনি। তারপর, বাসা গুছিয়ে নেবার পর, ওরা এল। মাসটা ছিল। ডিসেম্বর। কড়া শীত। সকলেই নিষেধ করেছিল, এ সময়ে ওদের আনবেন না। আলি সে পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নি। পাছ প্লেন থেকে নেমে বাসা পর্যন্ত যেতেই শীতে কষ্ট হয়, তিনি স্ত্রী আর দুমেয়ের জন্যে গরম কোট কিনে হিথরো এয়ারপোর্টে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখনো স্পষ্ট চোখে ভাসে। পি.আই.এ-র পাশ থাকবার দরুণ একেবারে

ভেতর পর্যন্ত গিয়েছিলেন তিনি। মায়ের কোলে ছিল মাহজাবীন, আর পাশে টুরটুর করে হেঁটে আসছিল ইয়াসমিন। আলি দৌড়ে গিয়ে খপ করে কোলে তুলে নিয়েছিলেন তাকে।

হাহাকার করে ওঠে বুকের ভেতরে।

কাঁধের পরে কোমল একটি হাত অনুভব করেন তিনি। একাত্তর সালে পি.আই.এ-র চাকরি থেকে বিদায় নেবার পর এই ঘরে এই আপিসে নিজের এজেন্সি যখন গড়ে তুলছেন, তখন ইয়াসমিন একেকদিন পা টিপে টিপে পেছনে এসে দাঁড়াত।

চোখ ফিরিয়ে দেখেন, নাহার।

মেয়েদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেছেন তিনি আজীবন। ইয়াসমিন যখন পা টিপে আসত, মেয়েটির কি ইচ্ছে করত, বাবার গায়ে হাত রাখে? সাহস পেত না? তিনি তিরস্কার করতেন, যদি হাত রাখত?

স্বামীর বিরল চেহারা দেখে নাহার ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে, তুমি কিচ্ছু ভেব না। সব ঠিক আছে।

আলি যেন এক মুহূর্তের জন্যে কিছুই বুঝতে পারেন না।

চা খেয়ে নিয়েছে। এখন এক মুশকিল হয়েছে।

কী, কীসের মুশকিল?

বীনাকে নিয়ে ওরা একটু বেরুতে চাইছে। সঙ্গে নাসরিনও যাবে।

মাহজাবীনকে পছন্দ করে ফেলল নাকি? দেখতে ওকেও তো সতের আঠার লাগে।

কী যে তুমি বল! বীনা যে ছেলেমানুষ। ওরা কী গাড়ি করে এসেছে, কত মাইল স্পীডে এসেছে, এই সব গল্প তুলে বীনা বেশ মাতিয়ে রেখেছে, এরই মধ্যে শুনি ডাক্তার বলছে, বেশ তো গাড়ি করে ঘুরিয়ে আনি। বীনা রাজি হয়ে গেল আমাকে জিগ্যেস না করেই। আমি আর কী করি, নাসরিনকে সঙ্গে নিতে বললাম। যাবে আর আসবে।

এ আবার কোন বিপদ হলো? আলি আবার সাগরে গিয়ে পড়েন।

নাহার বলে, যেতে না দিলে খারাপ দেখাবে। বীনাকে অবশ্য আমি রান্নাঘরে ডেকে সব বলে দিয়েছি। নাহার ওপরের দিকে শংকিত দৃষ্টিপাত করে ফিসফিস করে বলে, মেয়েকে না বলে আর রাখা গেল না। মেয়েটি তোমার ভালো। ঘুনাক্ষরেও ওরা জানতে পারবে না। ইয়াসমিনের কথা।

তবু ছেলেমানুষ।

না, না। বীনা নিজে আমাকে বলল, সে জানতেই দেবে না। বোনের জন্যে ওরও তো একটা কষ্ট আছে। কীসে সুনাম, কীসে দুর্নাম, তা কি বোঝে না? কী সুন্দর আলাপ করছে, দেখে আমিই অবাক।

১৩. গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে

গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে এবার ভাইয়ান। মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়েছে। চটপটে, মুখশ্রী সুন্দর, বয়সটাও কম। এই শেষ দিকটাই ভাইয়ানকে মাতিয়ে রাখে। অধিকাংশ বাঙালির মতোই তার মজ্জাগত যে কয়েকটি রক্ষণশীলতা রয়ে গেছে, তার একটি হচ্ছে, মেয়েদের বারো বছর বয়স থেকেই সহবাসযোগ্য মনে করা, বিয়ের জন্যে মোলর ধারে কাছে পাত্রী খোজা। সে একেবারে আটখানা হয়ে থাকে। বারীকে না বলে এতদূর টেনে আনবার জন্যে কিছু সময় আগেও যে অপরাধবোধ ও কুণ্ঠা ছিল, এখন আর তা নেই। বরং বারীর উপস্থিতিকে সে এখন অবাঞ্ছিত মনে করছে, শাপশাপান্ত করছে। বেশ হয়েছে, বারী যেমন যুবতী পাগল, তার ভাগ্যে পেছনের সিটে পড়েছে ন বছরের পুঁচকে নাসরিন।

সাঁৎ করে গাড়ি পথে নামায় ভাইয়ান।

তোমাকে তুমি করেই বলি, কেমন?

মাহজাবীন নিঃশব্দে সুন্দর করে হাসে। সে জানে, ঠিক কোন হাসিটি কোথায় গিয়ে টুং করে শব্দ তোলে। ভাইয়ান উৎসাহের সঙ্গে গাড়ি চালায়, ঘন ঘন আয়নায় নিজের চেহারা দ্যাখে। লাইব্রেরির কাছে গাড়ি আসতেই মাহজাবীন বলে, সহসা মনে পড়িল। বাম দিকে মোড় নিন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভাইয়ান বাম রাস্তায় গাড়ি আনে, এনেও ধীরে চালাতে থাকে।

একটি বাড়ি হইতে একটি ব্যাগ তুলিতে হইবে।

পেছন থেকে নাসরিন বলে ওঠে, কীসের ব্যাগ।

আমার সহিত আসিলেই দেখিতে পাইবে। মাহজাবীন মনে মনে বিরক্ত হয়। এই মেয়েটিই সব ভণ্ডুল করে দেবে। অথচ একে না নিলে মা বেরুতেই দিতেন না। চমক্কারভাবে সে গাড়ির কথা তুলে, বারবার গাড়ির প্রশংসা করে বেরুবার পথ করে এনেছিল, ফাঁদে পা দিয়ে ভাইয়ান তাকে নিয়ে বেরুতে চেয়েছিল, মাটি করে দিল নাসরিন।

এই বাড়ি।

চন্দনাদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই দাঁড় করায় সে ভাইয়ানকে।

এক মিনিটে ফিরিব। নাসরিন, আইস।

যখন নিশ্চিত যে, এতদূর থেকে তাদের কথা ওরা শুনতে পাবে না, মাহজাবীন বলে, নাসরিন, একটি গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে। নহিলে বড় দিন আসিতেছে, সান্তাক্লজকে বলিয়া দিব, তোমাকে আর উপহার দিবে না। যদি আমার কথা শোন, তোমাকে আগামী সপ্তাহেই বায়োনিক উম্যান পুতুলটি কিনিয়ে দিব।

নতুন এই পুতুলটা বাজারে বের হবার পর থেকেই নাসরিন বায়না ধরেছিল। আলি বা নাহার কেউই তা পাত্তা দেয় নি বলে নাসরিনের একটা ক্ষোভ ছিল। সে এখন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সত্য বলিতেছ?

হাঁ। আগামী শনিবারেই পাইবে।

কী গোপন করিতে হইবে?

আমি আজ যেখানে যাই, যাই করি, বাড়িতে মাম বা ড্যাডি জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, কী বলিবে পরে তাহা আমি শিখাইয়া দিব। এই লও, দশ পেনি অগ্রিম দিতেছি।

চন্দনা দরোজা খুলে দেয়। মাহজাবীন ও নাসরিনকে এক সঙ্গে দেখে উপলক্ষ্যটা ঠিক বুঝতে পারে না।

কী ব্যাপার?

ব্যাগটি লইতে আসিয়াছি। ভিতরে আর যাইব না। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ব্যাগ দিয়ে দরোজা বন্ধ করেও পুরো বন্ধ করে না চন্দনা। একটু ফাঁক রেখে চোখ চালিয়ে মাহজাবীনের গতিবিধি লক্ষ করে। তাকে একটা ঝকঝকে বড় গাড়িতে উঠতে দেখে অবাক হয়। এ গাড়ি কার! দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে তার। নাহ্, মাহজাবীন সত্যিই ভাগ্যবতী।

গাড়িতে বসতেই ভাইয়ান বলে, ব্যাগের ভেতরে কী?

মহিলাদের ব্যাগের খবর লইতে নাই। বলেই সে আবার সেই টুং করা হাসিটা উপহার দেয়।

আর কোনো ব্যাগ লইতে নাই? ভাইয়ান রসিকতা করে।

না, নাই।

কোনদিকে তাহলে যাব?

মুশকিলে ফেলিলেন। মাহজাবীন ভালো করেই জানে, কোথায় তার এখন গন্তব্য, তবু কপাল কুঁচকে চিন্তা করবার ভান করে।

পেছন থেকে বারী বলে ওঠে, মুশকিল তো কেবল শুরু হইল।

মাহজাবীন সায় দেয়। হাঁ, তা হইল।

নাসরিন উদগ্রীব হয়ে বলে, তোমাদের কি গোপন কোনো কথা হইতেছে?

মাহজাবীন তাকে ধমক দেয়, নাসরিন। বায়োনিক উম্যান স্মরণ রাখিও।

নাসরিন চুপ করে যায়।

মাহজাবীন স্টিয়ারিং হুইলে চাপড় দিয়ে বলে, উপকার যখন করিতেছেন, আরো একটি করিবেন?

ভাইয়ান বিগলিত হয়ে যায়। মাহজাবীন কী সুগন্ধ মাখে? নামটা জেনে নিতে পারলে, আজই একটা শিশি কিনে উপহার দেওয়া যেত।

এই ব্যাগটি পৌঁছাইতে হইবে।

কোথায়?

অলবানি স্ট্রীটে।

অলবানি স্টীট কোথায়?

আমি জানি না। আপনার গাড়িতে মানচিত্র নাই?

১৪. বজলুল করিম টিকিটটা ভালো করে দেখে

বজলুল করিম টিকিটটা ভালো করে দেখে নিয়ে বেশ যত্ন করে পকেটে রেখে, চোখ থেকে চশমা নামিয়ে খাপে পুরে, খাপটি কোটের পকেটে রেখে, টেবিলে দুহাত জড়ো করে বলেন, আলি সাহেব, একটা ইনফরমেশন দিতে পারেন?

বলুন।

ঢাকায় তো যাচ্ছি। ঢাকা থেকে সঙ্গে কাউকে আনতে হলে, তার টিকিট কি এখান থেকে কেনা যায়? আমি শুনেছি, ঢাকায় লন্ডনের টিকিট কেনা অনেক ঝামেলা। পারমিশনের ব্যাপার আছে।

ব্যবসা ছেড়ে দিতে নেই। আলি বলেন, এখান থেকে টিকিট নিয়ে যাওয়াই ভালো। আপনি এখানে দাম দেবেন, অ্যাডভাইস চলে যাবে ঢাকায়, টিকিট সেখানে নিয়ে নেবেন। ভেতরের কলকজা আর বিশেষ খুলে বললেন না আলি।

তাহলে আপনি তাই অ্যাডভাইস করছেন?

হাঁ। আমিই আপনাকে করিয়ে দিতে পারি। কজন আসবে?

একজন। সেই একজনই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যবসাটা পাবার জন্য আলি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন।

তা এ রকম বোঝা তো আমাদের বইতেই হয়। তবু তো আপনি এখানে আছেন, পাউন্ড রোজগার করছেন, দেশের বোঝা যতই হোক, অতটা নয়। টাকায় উপার্জন করে বোঝা। টানা, সে যারা টানে তারা বোঝে।

তা অবশ্য।

ভদ্রলোককে বেশ বিচলিত দেখায়। আলির চোখ এড়ায় না।

যাকে আনতে চান তার এনট্রি পারমিট এ-সব আছে তো? সে কিন্তু লম্বা ঝামেলা। বিশেষ করে এখন।

না, না, সে-সব আছে। কোনো অসুবিধে নেই। আমারই মেয়ে, এখানে এতদিন আমার কাছেই ছিল।

আলি হঠাৎ ব্যবসায়ী থেকে পিতা হয়ে যান। কৌতূহল হয় তার।

আপনার মেয়ে?

হাঁ, আমার মেয়ে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। তাকে আনতেই দেশে যাচ্ছি। আর বলবেন না। ভদ্রলোক সখেদে উচ্চারণ করে গুম হয়ে বসে থাকেন খানিক।

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কেন?

না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। বাঙালিয়ানা সব ভুলে যাচ্ছিল। আমাদের ফ্যামিলিতে ও-সব তো চলে না। একেবারে বাড়াবাড়ি দেখে বহুকষ্টে জোরজার করে বছরখানেক আগে ঢাকা পাঠিয়ে দিই আমার শশুরের কাছে।

আলি ব্যগ্র হয়ে জিগ্যেস করেন, তারপর?

একে সেখানে বাবা নেই, মা নেই, নানা-নানী। আলি সাহেব, অনেকদিন থেকেই আপনাকে জানি, নিজের লোক মনে করি, তাছাড়া আপনারও ফ্যামিলি আছে, ঢাকা নাকি এখন লন্ডনকেও ছাড়িয়ে গ্যাছে।

বলেন কী? এত অভাব অভিযোগ।

রাখুন সাহেব অভাব অভিযোগ। সে তো নিচের তলায়। আর অভাব অভিযোগের সঙ্গে তো আপনার, কী বলে, ভ্যালু জাজমেন্ট বা মরালিটির কোনো সম্পর্ক নেই। ঢাকায় মেয়েরা এখন যা করছে অনেক ইংরেজ মেয়েও নাকি তা করতে দুবার চিন্তা করবে।

প্রতিবাদ করতে প্রেরণা পান আলি, কিন্তু নিজের মেয়ের কথা টেনে যখন বলছেন, ভদ্রলোককে অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ থাকে না।

করিম সাহেব বলেন, যাকগে, এখন ঠিক করেছি ফিরিয়ে আনব। আমার কাছেই রাখব। কাছে থেকেই সহ্য করতে পারি নি, দূর থেকে শুনে কি সহ্য হয়? আপনি তাহলে মেয়ের একখানা টিকিটের ব্যবস্থা করে দিন।

শুকনো গলায় আলি বলেন, করব। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি দিয়ে আসব। আপনার বাসায়।

সে তো ভালোই হয়, খুব ভালো হয়। আমার যা মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। মেয়েকে নিয়ে না আসা পর্যন্ত শান্তি নেই। সে তো আসতেই চায় না। তাই যাচ্ছি।

আসতে চায় না কেন?

তেতো গলায় করিম সাহেব বলেন, নিজে বোঝেন না? সেখানে সুযোগও আছে, স্বাধীনতাও আছে।

টিকিটের দাম চেক লিখে দিয়ে বজলুল করিম ধীর পায়ে বেরিয়ে যান।

১৫. ইলিং থেকে আলবানি স্ট্রীট

ইলিং থেকে আলবানি স্ট্রীট দূর হলেও সোজা রাস্তা। ওয়েস্টার্ন এভ্যেনু ধরে গেলেই হলো। মাদাম ত্যুসো-র মোমপুতুলের যাদুঘর পেরিয়ে একটু পরেই বাঁ হাতি রাস্তা। ভাইয়ানের হাতে গাড়ি উড়ে চলে। মাহজাবীন অনেকক্ষণ কোনো প্রসঙ্গ তোলে না বলে, তার সন্দেহ হয়, মেয়েটি তাকে অপছন্দ করছে না তো?

ভাইয়ান অনেক ভেবে কোনো প্রসঙ্গ না পেয়ে হাতের কাছে যা খুঁজে পায় তাই তোলে। গাড়ি কেমন?

মাহজাবীন সংক্ষেপে উত্তর দেয়, উত্তম।

তুমি কি একেবারেই বাংলা বলতে পার না?

কিছু কিছু পারি। অনেক বুঝি।

এই তো সুন্দর বাংলা বলছ।

ভালো একসপ্রেশন হয় না।

চেষ্টা করলেই হবে। বাঙালি মেয়ে, বাবা-মা বাঙালি, চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। ইংরেজ তো আর নও।

লোকটির কথা শুনে গাড়ল মনে হয় মাহজাবীনের। তবু অলবানি স্ট্রীটে লোকটার ঘাড়ে চেপে যাওয়া যাচ্ছে, মাহজাবীন মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখে।

পেছন থেকে অনেকক্ষণ পর বারী মুখ খোলে। মাহজাবীনকে লক্ষ্য করে বলে, বুঝতে পারছেন না? বাংলায় একটা কথা আপনার মুখ থেকে শুনতে চায়। গাড়ির কথা জিগ্যেস। করছিল, গাড়ি কেমন? গাড়ি নয়, নিজে কেমন সেটাই আসল প্রশ্ন। দিয়ে দিন উত্তর। বলে হা হা করে হাসে লোকটা।

বুঝিলাম না।

জানিতে চায়, গাড়ি নয়, গাড়ির মালিক আপনার পছন্দ হইয়াছে কি?

বড় স্কুল মনে হয় মাহজাবীনের। এক ঘণ্টার আলাপেই এরা একটি মানুষের পাজামার ভেতর ঢুকে পড়তে চায়। নিষ্ঠুরভাবে সে খেলাতে শুরু করে তখন। বারীকে বলে, আপনি বিবাহিত?

না। সৌভাগ্যবান নহি।

বিবাহ করিবেন?

কন্যা পাইলে করিব।

কন্যা পান নাই।

পাইয়াছি অনেক। পছন্দ হয় নাই।

এখনো বাজার করিয়া চলিয়াছেন?

হাঁ, আশা ছাড়ি নাই।

মুল্যহ্রাসের আশায় রহিয়াছেন কি?

রসিকতাটি ঠিক রসিকতা নয় বলে বারীর সন্দেহ হয়। সে হাসতে গিয়েও আধখানা হেসে বিসদৃশভাবে চুপ হয়ে যায়।

লক্ষ রাখিবেন, ইতিমধ্যে স্বয়ং আপনার মূল্য না হ্রাস হইয়া যায়। ঈশ্বর না আপনার দেহে বিরাট মূল্যহ্রাস ঝুলাইয়া দেন।

গুম হয়ে যায় বারী। গোড়াতেই তাকে যে এতদুর টেনে আনা হয়েছিল, এর জন্যে আবার সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে মনে মনে।

মাহজাবীন এবার ভাইয়ানকে নিয়ে পড়ে। তার ওপর রাগটা আরো বেশি, কারণ এই লোকটিই তো ইয়াসমিনকে গাভীর মতো ব্যবহার করতে চায়।

আপনি কী রকম বাজার করিয়াছেন?

আমি? না, একেবারেই না, মোটেই না।

আমিই প্রথম?

ভাইয়ান আমতা আমতা করে।

মাহজাবীন বলে, সত্য বলিলে কিছু মনে করিব না।

ভাইয়ান বলে, মিথ্যে করে বলে, এই প্রথম কন্যা দেখিতে আসিলাম।

ইংরেজিতে মিথ্যে কথাটা বলে ততটা অপরাধী মনে হয় না নিজেকে।

আমাকে পছন্দ হইয়াছে?

তোমার কী মনে হয়?

মাহজাবীনও মেয়েলিপনা করে, সুর তুলে, বাংলা জবাব দেয়, কেন বলব? মেয়ে বলে না। ছেলে বলে।

ভাইয়ান শরীরের ভেতরে শিহরণ অনুভব করে। এমনকি সে গিয়ার বদলাবার ছুতোয় মাহজাবীনের উরু ছুঁয়ে দেয়। রাগে ভেতরটা দপদপ করতে থাকে মাহজাবীনের। একটা নিষ্ঠুর খেলা তার মাথায় আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ে ফিরে যায় সে।

চুপ করিয়া আছেন কেন? উত্তর দিন। পছন্দ হইয়াছে?

হাঁ খুব পছন্দ তোমাকে।

সত্য?

ঈশ্বর উপরে। আমার বিষয়ে কিছু বলিলে না?

কী বলিব?

আমাকে পছন্দ কিনা?

আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, পুরুষের পছন্দকেই একমাত্র জ্ঞান করি। আমি আপনার উপযুক্ত হইতে পারিব কিনা কে জানে, আপনি যে আমাকে দয়া করিয়া পছন্দ করিয়াছেন, আমি সৌভাগ্য বিবেচনা করিতেছি।

ভাইয়ান হাতে চাঁদ পাবার সুখ অনুভব করে। অন্তরে বাঙালি বাইরে ইংরেজ, সোনায় সোহাগা আর কাকে বলে? একেবারে জাত ইংরেজ মেয়ে ঘরে আনতে তার যেমন ভয়, তেমিন পুঁইশাকের গন্ধমাখা বাঙালি মেয়ে তার বিবমিষার উদ্রেক করে। অথচ দুটোরই মজার দিক সে লুটতে চায়। এরকম ভাগে ভাগ আর সে কোথায় পেত। খুশিতে সে মাহজাবীনের কাছে একটা হাতই ক্ষণকালের জন্যে ছুঁইয়ে দেয় বিনা ছুতোয়।

পেছন থেকে খসখসে গলায় বারী বলে, মাদাম তুসো পেরিয়ে গেলাম, ডাক্তার সাহেব। আলবানি স্ট্রীটে যাচ্ছেন তো?

১৬. অধিকার বোধের পাখায় ভর করে

সদ্য অধিকার বোধের পাখায় ভর করে গাড়ি থেকে মাহজাবীনের সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ানও নেমে আসে। পেছন পেছন দরোজা পর্যন্ত আসবার উদ্যোগ দেখে সে বলে, আপনি অপেক্ষা করুন।

চুপসে গিয়ে ভাইয়ান গাড়িতেও ঢোকে না, সঙ্গেও যায় না। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝুলি থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা বের করে আবার নম্বর মিলিয়ে নেয় মাহজাবীন। তারপর ভারি আর চওড়া কালো কাঠের দরোজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়! দরোজার গায়ে কোনো বেল বোম নেই। তাহলে? হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, এখানে যারা আছে, তারা জোর করে দখল করে আছে। সে দরোজায় করাঘাত করে। সাড়া পাওয়া যায় না। আবার করাঘাত করে। অপেক্ষা করে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সাড়া পাওয়া যায় না। ভুল ঠিকানা নয় তো? কিম্বা বাড়িতে কেউ নেই? এত অভিনয় করে একটা উজবুককে পটিয়ে এতদূর আসাটাই বৃথা হয়ে গেল? পেছন ফিরে তাকায়। রাস্তার ওপারেই পুলিশ থানা। এতক্ষণ থানার নীল চৌকো ডোমবাতিটা চোখে পড়ে নি। এখন দেখেই কেমন ভয় করে মাহজাবীনের। থানার এত কাছে? এদের সাহস আছে বলতে হয়?

ক্যাঁচ করে শব্দ হতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠেছিল আর কী। তাকিয়ে দ্যাখে চওড়া দরোজার ভেতর থেকে একটুখানি ফাঁক করে ঘন দাড়িওয়ালা এক শ্বেতাঙ্গ উঁকি দিয়ে নিঃশব্দে তাকে দেখছে। দরোজা ভেতর থেকে সেফটি-চেন দিয়ে আটকান।

অনেকক্ষণ পর দাড়ির ফাঁকে হাসি বিচ্ছুরিত হয়।

কাহারো সাক্ষাতপ্রার্থী?

হাঁ। আমার ভগ্নী এখানে থাকে।

তাহার কী নাম?

ইয়াসমিন। মাত্র গতরাত্রি আসিয়াছে।

হাঁ, উহারা ত্রিতলে আছে।

সে ভেতরের চেন খুলে দেয়। মাহজাবীন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ গতিতে দরোজা বন্ধ করে দেয় তরুণটি। তারপর মাহজাবীনের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিপাত করে নিঃশব্দে হাসে। বলে, আমাদের সাবধান থাকিতে হয়। মালিক জোর করিয়া ঢুকিতে পারে। পুলিশ আসিতে পারে। ঐরূপ আলামত দেখিলে আমরা দরোজা খুলি না। তোমার ভগ্নী অপেক্ষা তুমি সুন্দর। যাও, সিঁড়ি বাহিয়া ত্রিতলে সর্বদক্ষিণ দরোজায় ঘা দিবে। সেখানে আছে।

সিঁড়িগুলো অত্যন্ত চওড়া এবং বেশ উঁচু উঁচু। দরোজা জানালা অতিকায়, ছাদ গগনস্পর্শী প্রায়। বাড়ির ভেতরে ভ্যাপসা গন্ধ। বাড়ির প্রাচীনত্ব, অধিবাসীদের বিচিত্র রান্না, আর তামাকের ধোঁয়া মিলিয়ে গন্ধটা স্থির ঝুলে আছে। মাহজাবীন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে না ভেবে পারে না, ইয়াসমিন এখানে থাকবে কী করে? শুভাকাঙ্ক্ষার ক্ষীণ একটা জ্যোৎস্না তার ভেতরে বিকীর্ণ হতে থাকে।

তেতলায় উঠে একেবারে ডান দিকের দরোজা আধো খোলা দ্যাখে সে। কাছে এসে উঁকি দেয়। কয়েকজন তরুণ তরুণীকে দেখা যায়। ইয়াসমিনকে দেখা যায় না। তারা মাহজাবীনের দিকে ফিরে তাকায়। কিন্তু অবাক হয় না, কিম্বা চোখে কোনো প্রশ্ন আঁকে না। একটি মেয়ে আমন্ত্রণের হাসি নিয়ে ভেতরে আসতে ইশারা করে তাকে। দরোজা ঠেলে। ভেতরে ঢুকতেই দেখা যায় ইয়াসমিনকে। ছেড়া এক টুকরো কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, চোখ বোজা, মনে হয় মৃত। বুকের ভেতরে ছাৎ করে ওঠে মাহজাবীনের। পা অবশ হয়ে যায়। ব্যাকুল চোখে সবার দিকে দৃষ্টিপাত করে।

সে ঘুমাইতেছে।

মাহজাবীন তাকিয়ে দ্যাখে, গিটার কোলে এক তরুণ। তার আরো চোখে পড়ে, শুধু ইয়ামিন নয় আরো তিন জন ঘুমিয়ে আছে। এক তরুণ তরুণী প্রায় নগ্নদেহে নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘরের এক পাশে গ্যারাফিন হিটার জ্বলছে। তার উত্তাপে উষ্ণ

এবং সুখী মনে হয় যুগলদেহ। ক্ষণকাল আগের আশংকায় মাহজাবীন নিজেই ব্রিত বোধ। করে। সহজভাব হাসে সে।

মার্ক বলে, আমি মার্ক, তুমি ইয়াসমিনের ভগিনী।

হাঁ, এই ব্যাগ দিতে আসিয়াছি। দেরি করিতে পারিব না।

মার্ক পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে ঘুমন্ত ইয়াসমিনকে দ্যাখে।

মাহজাবীন বলে, না, জাগাইও না। বলিও আমি আসিয়াছিলাম।

মাহজাবীন আবার ঘুমন্ত যুগলকে দ্যাখে। তরুণীটির স্তন সৌষ্ঠব তাকে মুগ্ধ করে। আরেক যুবক যে ঘুমন্ত নয়, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে মাহজাবীনকে, তার পরনে কেবল অন্তর্বাস। যুবকের ধবধবে উরু সে এর আগে এত স্বাভাবিকভাবে দেখে নি। ক্ষণকাল তার চোখ সেখানেও আটকে থক। তারপর সে বলে, বলিও সব ঠিক আছে।

নেমে আসে মাহজাবীন। একেবারে নিচে পৌঁছুতেই, হলের পাশে টুক করে একটা দরোজা খুলে যায়। দাড়িওয়ালা সেই তরুণ উঁকি দেয়। তাকে দেখেই মৃদু হাসে। যেন বলতে চায়, হয়ে গেল। এর মধ্যেই চললে? মাহজাবীন তাকে বলে, এক মিনিটের মধ্যেই আমি আবার আসিতেছি, সঙ্গে একজন বন্ধু থাকিবে। আপত্তি নাই তো?

তরুণ সম্মতি দেয়।

মাহজাবীন বেরিয়ে হাত তুলে ইশারা করে ভাইয়ানকে ডাকে। সে তখনও পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইশারা পেয়ে দ্রুত পায়ে কাছে আসে সে।

কী ব্যাপার?

আলাপ করাইয়া দিব।

কার সঙ্গে? বলতে বলতে ভাইয়ান দূরে গাড়ির ভেতরে বারীকে একবার চট করে দেখে নিয়ে, উত্তরের অপেক্ষা না করেই মাহজাবীনকে অনুসরণ করে।

সেই রুশ সেফটি-চেন লাগিয়ে দরোজা ফাঁক করে এতক্ষণ দেখছিল, এখন দরোজা খুলে দেয়। তাকে দেখে একটু হকচকিয়ে যায় ভাইয়ান। তরুণ এখন নিঃশব্দে হাসে, সে আরো অপ্রস্তুত বোধ করে।

মাহজাবীন তাকে আশ্বস্ত করে বলে, বন্ধু।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে দুজন। ভাইয়ান ভ্যাপসা গন্ধটার জন্যে রুমাল বের করবে কি না চিন্তা করে। বদলে জিগ্যেস করে, এখানে কারা থাকে?

মানুষ।

তেতলায় পৌঁছে যায় ওরা। তেতলায় একেবারে ডান দিকের ঘরে ঢুকে জড়াজড়ি করে থাকা যুগলকে দেখে ভাইয়ানের চোখ কপালে উঠে যায়। মেঝের ওপর শুয়ে থাকা, বসে থাকা মানুষগুলোকে দেখে ভীষণ অপ্রতিভ বোধ করে।

মার্কের দিকে তাকিয়ে মাহজাবীন ক্ষমা প্রার্থনার নীরব হাসি নিবেদন করে। উত্তরে স্লান হাসে মার্ক।

ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারে না ভাইয়ান। তার দৃষ্টি এবার আবিষ্কার করে সবগুলো শাদার ভেতরে একটি বাদামি। ঘুমিয়ে থাকা ইয়াসমিন।

মাহজাবীন ইয়াসমিনের দিকে আঙুল তুলে ভাইয়ানকে বলে, ভালো করিয়া দেখিয়া লউন। আমার জেষ্ঠা ভগিনী। উহাকেই আপনার দেখিতে আসিবার কথা। পছন্দ করিবার কথা। আমাকে নহে।

হতভম্ব হয়ে যায় ভাইয়ান। ইয়াসমিনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

মাহজাবীন তীব্র গলায় বলে, আর উহাকে দৃষ্টি দিয়া লেহন করিবেন না।

নিচে নেমে, পথে বেরিয়ে মাহজাবীন বলে, বজ্রাহত হইবার অভিনয় না করিলেও চলিবে। আপনার বন্ধুটির মতো আপনিও কন্যা দেখিয়া বেড়ান, বাংলাদেশের বাজারে বহু গাভী আছে।

গাড়ির কাছে এসে মাহজাবীন বলে, নাসরিন, বাহির হও।

তুমি কি আজই বায়োনিক উম্যান কিনিয়া দিবে?

বাহির হও।

মাহজাবীন সরাসরি না তাকিয়েও টের পায়, বসন্তমুখে কালো টেকো ডাক্তারটি কিছু না বুঝেই বোকা হয়ে গেছে, একবার তার দিকে, একবার ভাইয়ানের দিকে তাকাচ্ছে।

পাতাল রেলপথে বাড়ি ফিরে মাহজাবীন ঘোষণা করে, মাম, ভাবিও না। সে বিদায়। হইয়াছে।

মিস্টার আলি উদ্বিগ্নস্বরে জানিতে চান, কটু ব্যবহার করিস নি তো?

বুঝিলাম না।

জানিতে চাহিতেছি, রূঢ়ভাবে বিদায় দাও নাই তো? সে যে তোমাকে পৌঁছাইয়া দিল না?

সে চাহিয়াছিল।

ও। আশ্বস্ত হন আলি।

ড্যাডি, তোমার নিন্দা হইতে দিব না। বিদায় মুধর হইয়াছিল।

১৭. নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছি

মার্ক, আমি নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছি।

মাঝরাতে কাছের রাস্তা ও দোকানগুলো যখন জনজঙ্গল আর নয়, তখন সোহো স্কোয়ার লোকের ভিড়ে গমগম করছে। চারদিকে এত উজ্জ্বল আলো যে, আলোকেই মনে হয় কলরব মুখোরিত। অধিকাংশ দোকান স্টল, রেস্তোরা খোলা। বিদেশী পর্যটকদের ভিড়। উঁাড়া চিহ্ন দেওয়া ছবি, বিবসনা রমণীর দেহ এবং আসন প্রদর্শনী আর ডিস্কো নাচের আসরগুলোতে মানুষ ভিড় করে ঢুকছে। কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আধ ঘণ্টা পরের সেশনে ঢুকবে, চলতিটায় আসন পায় নি। কেউ জানালায় সাঁটা নগ্ন মেয়েদের পোস্টার দেখছে, ভেতরে ঢুকবে কি না মনস্থির করতে পারছে না। কেউ সুইচ সেন্টারের মাথায় আলোয় লেখা চলমান বিশ্ব সংবাদের শিরোনাম পড়ছে, রেকর্ডের খোলা দোকানে হ্রাসমূল্য রেকর্ড কিনছে কেউ। সুভ্যেনিরের দোকানে লন্ডন স্মৃতি কিনছে। আর কিছু লোক অলস স্রোতে জলজগুলোর মতো ভেসে চলেছে।

অলবানি স্ট্রীটের দল, ইয়াসমিনের সোনার লকেট বেচার টাকায়, আজ সোহোতে এসেছিল চাইনিজ খেতে। এখন তারা জলজগুল হয়ে গেছে। ভিনসেন্ট, পিটার আর জো একেকটি মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটছে। মার্ক একা পেছনে, ইয়াসমিনও একা, পাশে এবং দূরে।

শরীরের ভেতর দুর্বোধ্য একটা অনুরণন বোধ করে ইয়াসমিন, ব্যাথাটা শারিরীক কিম্বা আত্মীক সে অনেকক্ষণ স্থির করতে পারে না। এমনও মনে হয়, অন্য কারো শরীর ধারণ করে সে চলাচল করছে।

এক সময়ে পিছিয়ে এসে মার্ক পাশে চলতে শুরু করে।

মার্ক, আমি নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছি।

হাঁ, ইহাতে দুঃখিত হইও না। নিঃসঙ্গতা সচেতন ব্যক্তিই অনুভব করে। অস্থির ভেতরে। মার্ক, আমার ভালো লাগিতেছে, এবং লো লাগিতেছে না।

মার্ক চুপ করে থাকে।

ভিনসেন্ট হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, দলকে সমবেত করে। দু তিনজনকে এক সঙ্গে কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলে, হাঁ, হলুদ শয়তানগুলোকে দ্যাখো।

তার আঙুল অনুসরণ করে দেখা যায়, একটা নাইট ক্লাবের সমুখে দশ বারোজন জাপানি। দেখে বোঝা যায়, পর্যটক ঠিক নয়, ব্যবসার কোনো কাজে এসেছে, অবসরে ফুর্তি করতে বেরিয়েছে। তাদের বিচিত্র কলরব শুনে দলের আমোদ হয়। এতক্ষণ উদ্দেশ্যহীন নিরবতা ছিল, তা হো হো হাসিতে তারা ছিঁড়ে ফ্যালে।

দুলকি চালে সবাই এগিয়ে যায়। ভিনসেন্ট এক জাপানিকে বলে, পয়সা কেন খরচ করিবে এখানে? চাও তো, আমার বালিকারা দেখাইবে। এইসব বালিকা উহাদের চেয়ে উত্তম।

জাপানিদের ভেতরে সবাই ইংরেজি বোঝে না। একজন বোঝে। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে ওঠাতেই টের পাওয়া যায়। তাই সে একটু এগিয়েও আসে।

তখন পিটার জাপানিটির কাছে ঘেঁষে কোকোকে দেখিয়ে বলে, ইহাকে লইবে?

জাপানিটি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে।

জো প্যামের চিবুক তুলে ধরে বলে, এবং ইহাকে?

ভিনসেন্ট বলে, তোমাদের মুখে ইহারা সুন্দর বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। হাঁ?

জাপানিটি ইংরেজি ভালো জানে না, তাই মর্মার্থ তার বোধগম্য হয় না।

ভিনসেন্টের রসিকতা শুনে দলের পেটে হাসি বুড়বুড় করছিল, জাপানিটি যখন হাতের আঙুল তুলে আন্তর্জাতিক নিরব ভাষায় জানতে চায় ঐ কাজের দরুন তারা পারিশ্রমিক কত চায়, তখন গোটা দল, এমনকি ইয়াসমিনও দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে। হতবাক। জাপানিদের পেছনে ফেলে, হাসিতে ভেঙে পড়তে পড়তে তারা অন্য মজা সন্ধান করে।

এইভাবে বহুবার তারা চক্কর দেয় সুইস সেন্টার থেকে পিকাডেলির মোড় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ, পুরো পথটাই পথিকের।

মার্ক বলে, হাসিতেছ?

ইয়াসমিন থতমত খেয়ে যায়।

মার্ক আশ্বস্ত করে তাকে, হাসিবে না কেন? উহারাও নিঃসঙ্গ। সেই নিঃসঙ্গতা কাটাইবার জন্য হাসিবার উপকরণ খুঁজিতেছে।

ইয়াসমিন আবার হেসে ফেলে সত্যি। বিষ্ঠা ত্যাগের কথাটা যে জাপানিরা আদৌ বুঝতে পারে না, এখনো সুড়সুড়ি দেয় তাকে।

মধ্যপ্রাচ্যের দুই আরবকে দেখা যায়। দলের মেয়েগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে থাকে। যতবার সমুখ দিয়ে ওরা যায়, ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে।

ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল জো-র। সে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে দলকে থামিয়ে বলে, গরীব আরব দেখিবে?

হাঁ, হাঁ, কোথায়?

কলরব করে ওঠে সকলে।

ঐ দ্যাখো।

সেই আরব দুজন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে, এবার সকলের চোখে পড়ে।

কোকো জো-র গালে টোকা দিয়ে বলে, গরীব কী প্রকারে জানিলে?

নহিলে তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে?

কোকো একটু ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু অন্যান্য সকলেই হেসে ওঠে। তাদের বিদ্রুপের হাসিতে আরব দুজন মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ভিনসেন্ট তখন দলকে ঠেলে আরবদের পাশ দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে, কাছে এলে ঘাড় ফিরিয়ে আরবদের উদ্দেশ্যে বলে, এখানে পাইবে না; মহারানীর প্রাসাদে যাও। সেখানে অশ্বাননা রাজকুমারী অ্যান রহিয়াছেন। ছুটিবে এবং ভালো ছোটাইবে।

বলেই হা হা করে হাসতে হাসতে সকলে তাদের, অতিক্রম করে যায়।

নাহ, ফিরিয়া যাইতে হয়। প্যাম দুহাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভেঙে শরীর বাঁকিয়ে বলে।

আমি শয্যায় যাইতে চাই।

কি, আরবদের শয্যায়?

পিটারের দুমুখ মন্তব্য শুনে প্যাম তাকে লাথি মারে পেছনে। বলে, আরবরা বালক পছন্দ করে। তুমি তাহাদের শয্যায় যাও।

সবাই আবার এক প্রস্থ হেসে ওঠে।

ফেরাই স্থির হয়। নীরবেই স্থির হয়ে যায়। তারা আর সুইসসেন্টারের দিকে ফেরে না। ধীরে ধীরে এলাকা ছেড়ে এগোয় তারা। হেঁটেই তারা যাবে। অলবানি স্ট্রীট মাইল দেড়েকের মতো। শনিবার রাতে এমন বহু দল দুটো তিনটের সময় দেখা যায় অলস পায়ে ফিরে যাচ্ছে রাস্তার সমস্ত দখলিসত্ত্ব নিয়ে।

সোহো স্কোয়ারের ভেতরেই অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা রাস্তায় বাঁক নিতেই দেখা যায়, চীনা একটা রেস্তোরা, তারপরে গাড়ি ঢোকার মতো কাঠের চওড়া গেট, পাশে এক আলোকিত সরু দরোজা। দরোজার দুপাশে উজ্জ্বল হলুদ রঙের পটভূমিতে, কাচের আড়ালে সাঁটা উলঙ্গ নৃত্যকরা রমণীদের ছবি। দরোজার মুখেই কাউন্টারে দুজন বসে

আছে টিকিট বেচতে। আর দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে ঘন ঘন ভীরু দৃষ্টিপাত করছে বাদামি এক লোক।

লোকটিকে অতিক্রম করে যাবার মুহূর্তেই ভিনসেন্টের বাসনাটি হয়। সে বলে, বাদামি শুকরটি নতুন আসিয়াছে।

পেছন ফিরে তাকায় দলের সবাই। লোকটির ভীরু ভাব এতদূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। তাদের সমবেত স্ফূর্তি হয়।

ভিনসেন্ট ইয়াসমিনকে কাঁধে ধরে বলে, উহাকে ডাকিয়া আন। ভিনসেন্ট তার পিঠে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেয়।

ইয়াসমিন হেসে বলে, যদি আমাকে প্রস্তাব করে, বাঁচাইবে তো?

রগড় দেখবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে দলটি। ইয়াসমিন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে লোকটিকে হাত দিয়ে কাছে আসতে ইশারা করে। লোকটি প্রথমে শংকিত হয়। পরে, ইয়াসমিনের বাদামি রঙ দেখে, চেহারা ভারতীয় বলে আশ্বস্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

অন্ধকারের ভেতর আসতেই চারদিক থেকে দলটি ঘিরে ধরে লোকটিকে। এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে তাকে ঘিরেই আরো নির্জন অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তারা।

লোকটি ইয়াসমিনকে আর দেখতে পায় না। তার চারদিকে শাদা মুখগুলো দেখে, গায়ের ঝাঝালো। গন্ধ পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় সে।

ভিনসেন্ট বলে, নতুন আসিয়াছ?

লোকটি হয় প্রশ্ন বুঝতে পারে না, অথবা ভয়ে তার গলা শুকিয়ে যায়। সে ঠোঁট চাটতে থাকে ঘন ঘন। পিটার বলে, আমার গিরগিটি স্মরণ হইতেছে।

জো বলে, বাদামি শুকরটি গিরগিটির জিড়া প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির কৌতুক অবলোকন কর।

লোকটি বেরুবার চেষ্টা করে। গলা তুলে দলের মাথার ওপর দিয়ে আশেপাশে পথিক সন্ধান করে। তখন ভিনসেন্ট তার গলা ধরে বলে, তুমি সহবাস করিবে? শ্বেতাঙ্গ বালিকার সহিত নিদ্রা যাইবে? কত আনিয়াছ?

সকৌতুক দল লোকটির উত্তরের অপেক্ষা করে। সহবাসের উল্লেখে লোকটির জিভ একবার বেরিয়ে আর বেরোয় না।

পিটার লোকটির কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়।

যথেষ্ট আনিয়াছ তো?

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে কোটের দুদিক চেপে ধরে ভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠে, সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত, সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত।

শক্ত থাবায় তার মুখ চেপে ধরে ভিনসেন্ট। সবার দিকে হেলে তাকিয়ে বলে, ইহা ইংরাজি বলে দেখিতেছি। হইবে না কেন? সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত তো।

সকলে নিচু পর্দায় হেসে ওঠে। লোকটি ইয়াসমিনের দিকে ভয়ার্ত করুণ চোখে তাকিয়ে বলে, ছয় মাস পরে চলিয়া যাইব।

জো লোকটির পেটে ঘুষি দেয়। বলে, ছয় মাস সরকারি বৃত্তিতে শ্বেতাঙ্গ বালিকার সুখ লইবে? তবে এই লও। বলে, সে প্যামকে ধাক্কা দিয়ে লোকটির বুকের ওপর ফেলে দেয়। এবং পরক্ষণেই তাকে সরিয়ে দিয়ে লোকটির পেটে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে বলে, তুমি আমার বান্ধবীর গায়ে হাত দিলে কেন?

ভিনসেন্ট তার মুখ শক্ত করে চেপে ধরে রাখে। আর দমাদম তাকে লাথি ঘুষি মারতে থাকে জো আর পিটার। মেয়েরা দৃশ্যটাকে আড়াল করে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, পাছে পুলিশ না এসে যায়।

থাবায় মুখ আটকানো থাকলেও লোকটির মুখ থেকে একটি আর্ত শব্দ বেরিয়ে আসে, বাবাগো।

ইয়াসমিনের কাছে শব্দটি বিদ্যুৎবেগে পরিচিত বোধ হয়।

লোকটির রক্তমাখা ঠোঁট থেকে আবার উচ্চারিত হয়, আর না, আর না।

ইয়াসমিনকে ভিনসেন্ট প্রশ্ন করে, সে কী বলিতেছে? বুঝিতে পার?

বুকের ভেতরে কেমন যেন করে ওঠে ইয়াসমিনের। ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে অপরিচিত মনে হয়। ভয়ে তার উত্তর আপনা থেকে গড়িয়ে পড়ে, যথেষ্ট হইয়াছে বলিতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি কোথা থেকে শক্তি পায়। নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে খানিক। নিমজ্জমান মুমূর্ষ মানুষও কাঠের টুকরো দেখে বল ফিরে পায়। লোকটি ইয়াসমিনের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে বাংলায় বলে, আপনি বাঙালি, আপনি আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান।

এক ঝটকায় তাকে টেনে তোলে জো আর পিটার দুদিক থেকে। ভিনসেন্ট লোকটির দুই উরুর ফাঁকে প্রচণ্ড এক লাথি মারতেই লোকটি কোৎ করে ওঠে। ইয়াসমিনের দিকে আবার তাকায়। তার দৃষ্টিতে কী ছিল, ইয়াসমিন চোখ ফিরিয়ে নেয়।

লোকটিকে সংজ্ঞাহীন করে, তার পকেট থেকে টাকাগুলো নিয়ে দল অলবানি স্ট্রীটের দিকে গলা জড়াজড়ি করে এগোয়।

১৮. ঘুম আসে না ইয়াসমিনের

ঘুম আসে না ইয়াসমিনের। কেবলি সে এপাশ ওপাশ করতে থাকে। লোকটির চেহারা নয়, কণ্ঠস্বর তার স্মৃতিতে বার বার ফিরে আসে। লোকটি যে পরিষ্কার বাংলা কথাগুলো বলেছিল, এখন তা ইয়াসমিনের কানে তীব্র ভাষায় রূপ নেয়। বাংলা কি ইংরেজি, সে আর সচেতন নয়।

ঘর অন্ধকার। মেঝের ওপর প্রত্যেকে জায়গা দখল করে শুয়ে পড়েছে মাথা পর্যন্ত কম্বল টেনে। ইয়াসমিনকে দরোজার কাছে জায়গা দেয়া হয়েছে। দরোজার ফাঁক দিয়ে হিস-হিস করে হিম বাতাসের স্রোত আসে। তার দরুণ শীতবোধ হয়।

হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কুণ্ডলী পাকিয়ে সে শীতের সঙ্গে লড়াই করে। কম্বল আনে নি, গায়ের কোট খুলে ওপরে দিয়ে দিয়েছে সে।

নিজেকে রিক্ত এবং ব্যর্থ মনে হয় তার। ব্যর্থতাই বড় হয়ে তাকে রোমশ জন্তুর মতো চেপে ধরে। সেই সঙ্গে আবার তার মনে হয়, অন্য কারো শরীর সে ধারণ করে আছে, তার পুরনো দেহ বিদায় নিয়েছে, এই দেহের কোনো সংকেতই বোধগম্য বা নিয়ন্ত্রিত নয়।

পায়ের শব্দ পাওয়া যায়।

অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে মার্ক এসে ফিসফিস করে বলে, আমার কম্বল লও।

অনুভব করে মার্ক কোট সরিয়ে নিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয় তাকে। ইয়াসমিন মার্কের হাত ধরে থাকে কিছুক্ষণ। যেন সে এতক্ষণ উঁচু দালানের কার্নিশে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ একটা অবলম্বন পেয়েছে।

তুমি কী গায়ে দিবে?

আমি বসিয়া থাকিব।

ইয়াসমিন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। শীত পরাজিত হয়। উষ্ণতা ফিরে আসে।

মার্ক, তুমি আছ?

হাঁ, আমি আছি।

আমি কাঁদিতে ইচ্ছা করি।

কাঁদিও না, কেন কাঁদিবে?

তুমি ইহাদের মতো নও। তুমি ইহাদের সঙ্গে আছ কেন?

মার্ক কোনো উত্তর দেয় না।

ইয়াসমিন এবার কম্বলের ঢাকা সরিয়ে মুখ বের করে ফিসফিস করে বলে, চল আমরা দুজনে কোথাও চলিয়া যাই। মার্ককে নীরব দেখে ইয়াসমিন আঘো উঠে বসে। সঙ্গে সঙ্গে নাভীর নিচে ক্ষীণ অথচ গভীর একটা ব্যথা অনুভব করে, লোকটিকে তখন প্রহার করবার স্মৃতি ফিরে আসে, এই ব্যথাবোধ মানসিক এবং তারই সহানুভূতিতে বলে ইয়াসমিন মনে মনে ব্যাখ্যা করে নিয়ে, মার্কের হাত ধরে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, যাইবে মার্ক?

না, যাইব না।

তুমিও কি আমার ত্বকের রঙ ঘৃণা কর।

মার্ক তার কপালে হাত রাখে। তোমার ত্বকের রঙ সম্পর্কে আমি সচেতন নহি।

সে তো উহারাও নহে। আমার উপস্থিতিতে লোকটিকে বাদামি শুকর বলিল।

উহাদের কথা আলাদা। আমি উহারা নহি।

তবে যাইতে চাহ না কেন?

আমি দুঃখ এবং পতন প্রত্যক্ষ করিতে চাই।

আর কত করিবে?

জীবকাল পর্যন্ত। তোমার সঙ্গে যাইতে পারিলে খুশি হইতাম, সুখ আমি চাহি না। সুখের ভিতরে সম্পদ নাই, ঐশ্বর্য নাই। আমার সঙ্গীত মরিয়া যাইবে। সঙ্গীত ভিন্ন আমার বন্ধু নাই। মানুষ কখনোই মানুষের বন্ধু হইতে পারে না। ইহা অলংঘনীয় দূরত্ব।

ইয়াসমিন ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সে।

মার্ক বলে, তুমি নিদ্রা যাও।

উহারা লোকটিকে বাদামি শুকর বলিল কেন?

তুমি নিদ্রা যাও।

উহারা লোকটিকে প্রহার করিল কেন?

তুমি নিদ্রা যাও।

উহার লোকটিকে সর্বস্বান্ত করিল কেন?

তুমি নিদ্রা যাও।

আমি কেন প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। কেন বাধা দিলাম না। কেন তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম?

তুমি তো স্ব ইচ্ছায় আসিয়াছিলে। তুমি তো পূর্বেও বাধা দাও নাই। তুমি তো পূর্বেও প্রতিবাদ কর নাই।

ইয়াসমিন আবার উঠে বসে। গা থেকে কম্বল সরিয়ে বলে, কী বলিতেছ? এ কী যুক্তি দিতেছ?

যুক্তি যথাযথ।

তুমিও উহাদের দলে। তুমিও বাদামি শুকর বলিতে পার। আমার উপস্থিতিতে কী করিয়া বলিতে পারিল? তবে কি আমাকে অন্তর হইতে গ্রহণ করে নাই?

না, করে নাই।

ইয়াসমিন স্তব্ধ হয়ে যায়।

মার্ক বলে, মোহভঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া যাউক। বাক্য সত্য হউক। তোমাকেও বাদামি কুকুরী বলিয়াছে, তোমার সাক্ষাতেই বলিয়াছে।

না, বলে নাই। কে বলিয়াছে?

অবশ্য তোমার তখন উপলব্ধি করিবার মতো অবস্থা ছিল না। ভিনসেন্ট বলিয়াছে।

অন্ধকার বিকট ও দুঃসহ মনে হয় ইয়াসমিনের। দুর্বল কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, সত্য?

হাঁ। সত্য। তোমাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছি। মিথ্যা বলিব না। অপরাহ্নে ঘ্রাণ লইবার অধিবেশনে তুমি সম্পূর্ণরূপে উত্তোলিত হইয়া যাইবার পর, ভিনসেন্ট তোমার কুমারীত্ব হরণ করে।

না। আর্তনাদ করে ওঠে ইয়াসমিন। নাভির নিচে ক্ষীণ ব্যথাটা হঠাৎ তীব্র হয়ে যায়। মার্ক মন্ত্র পাঠের মতো উচ্চারণ করে চলে, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় তোমার শরীর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সম্ভবত তোমার যন্ত্রণা হইতেছিল।

ইয়াসমিনের স্মৃতিতে যন্ত্রণা নেই দেখে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে যায়। তার স্মৃতিতে মহাশূন্যে চন্দ্রযানের সুখকর সম্মুখ-ধাবমান। তার চেতনা এখন ক্রমশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে থাকে।

মার্ক নিষ্করুণ কণ্ঠে বলে যায়, তখন ভিনসেন্ট তোমাকে চড় মারিতে মারিতে বাদামি কুকুরী শান্ত হও বলিতেছিল।

চন্দ্রয়ান থেকে ছিটকে পড়ে ইয়াসমিন। ভয়াবহ দ্রুত গতিতে পতিত হতে হতে সে আকুল কণ্ঠে বলে, মার্ক আমাকে তুমি রক্ষা করিলে না?

মার্ক উত্তর দেয়, আমি তখন আমা হইতে বিযুক্ত ছিলাম।

১৯.

এত ভোরে দরোজায় বেল বাজতে শুনে মিস্টার আলি আর নাহার, দুজনে একই সঙ্গে নেমে আসেন। নাহার সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে থাকে দুঃসংবাদের দুঃসহ প্রতীক্ষায়। নিশ্চয়ই থানা থেকে পুলিশ ইয়াসমিনের কোনো খবর নিয়ে এসেছে। সে আল্লাকে ডাকে।

দরোজা খুলেই আলি হতভম্ভ হয়ে যান।

ইয়াসমিন দাঁড়িয়ে আছে।

নাহারের মনে হয়, বাস্তব এত সহানুভূতিশীল নয়। এ স্বপ্ন।

ইয়াসমিন বাবার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলে, ভিতরে আসিতে পারি?

আলি সরে দাঁড়ান নীরবে। ইয়াসমিন ক্ষণকাল অপেক্ষা করে ভেতরে পা রাখে। নাহার এসে তার হাত ধরলে, সে অধোমুখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে, সন্তর্পণে হাত ছাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। যেন, বাস্তব এখনো সত্যি বলে বিশ্বাস হয় না তাদের। তারপর, স্বামীর বুকে হাত রেখে নাহার বলে, আল্লা মুখ তুলে চেয়েছেন, ওকে তুমি কিছু বলো না।

দুজনে ওপরে এসে দেখেন, ইয়াসমিন তার ঘরে ঘরের দরোজা সে বন্ধ করে দেয় নি। ভোরের ধূসর আলোয় ইয়াসমিনকে দেখা যায় বিছানার ওপর হাতের বড় ব্যাগটা রেখে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

দূর থেকেই আলি ইয়াসমিনকে লক্ষ্য করে বলেন, নিজের বাড়িতে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতির আবশ্যক হয় না, স্মরণ রাখিও।

আলি তার নিজের ঘরে চলে যান। দরোজা বন্ধ হয়ে যেতেই নাহার ছুটে যায় ইয়াসমিনের ঘরে। দুহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সে বলে, তোর দয়া মায়া নেই, তুই পাষাণ, কী করে পারলি তুই?

ধীরে ইয়াসমিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, মাম, আমি ঢাকা যাব।

নাহার অবাক হয়ে যায়। ঢাকা?

দেশে যাব। ড্যাডিকে বল।

মেয়ের স্থির নিশ্চিত উচ্চারণ শুনে নাহার আর কিছু বলতে পারে না। ত্রস্ত পায়ে স্বামীর কাছে যায়।

নাহারের মুখে শুনে আত্মার ভেতরে চমকে ওঠেন মিস্টার আলি। শোবার ঘরের দেয়ালে টানানো পোস্টারের লেখা, ফ্লাই বিমান ফ্লাই হোম আজ এই প্রথম তার কাছে বিকট ও ভয়াবহ মনে হয়।

স্বদেশ কি এই গাঢ় সবুজ পোস্টারের মতো সুন্দর? কোন স্বদেশে ফিরে যেতে চায়। ইয়াসমিন।

ইউনিভার্সিটির সেই অধ্যাপকের কথা, বজলুল করিমের কথা, ডাঃ বারীর কথা, টুকরো টুকরো কথাগুলো আছড়ে পড়ে তার চেতনায়। আবার একই সঙ্গে সে কানে শুনতে পায়, তার আপিস ঘরে দুধের বোতলে জানালা ভাঙ্গার শব্দ, থানায় পুলিশের পরিহাস, সড়কে শ্বেতাঙ্গদের নিষ্ঠুর মন্তব্য।

মিস্টার আলি নিঃশব্দে সখেদে ক্রমাগত মাথা নাড়েন। তারপর হঠাৎ দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে অস্ফুট স্বরে বলেন, উহার কোনো স্বদেশ নাই, উহার কোনো স্বদেশ নাই।

তিনি নিজেও টের পান না, বিলাপের উচ্চারণ ইংরেজিতেই করছেন।